নারীমেধ

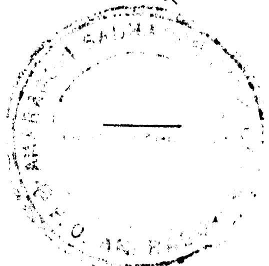


প্রিণ্টার
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু,
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
বেনারস-ব্র্যাঞ্চ।

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড—এলাহাবাদ

নারীমেধ

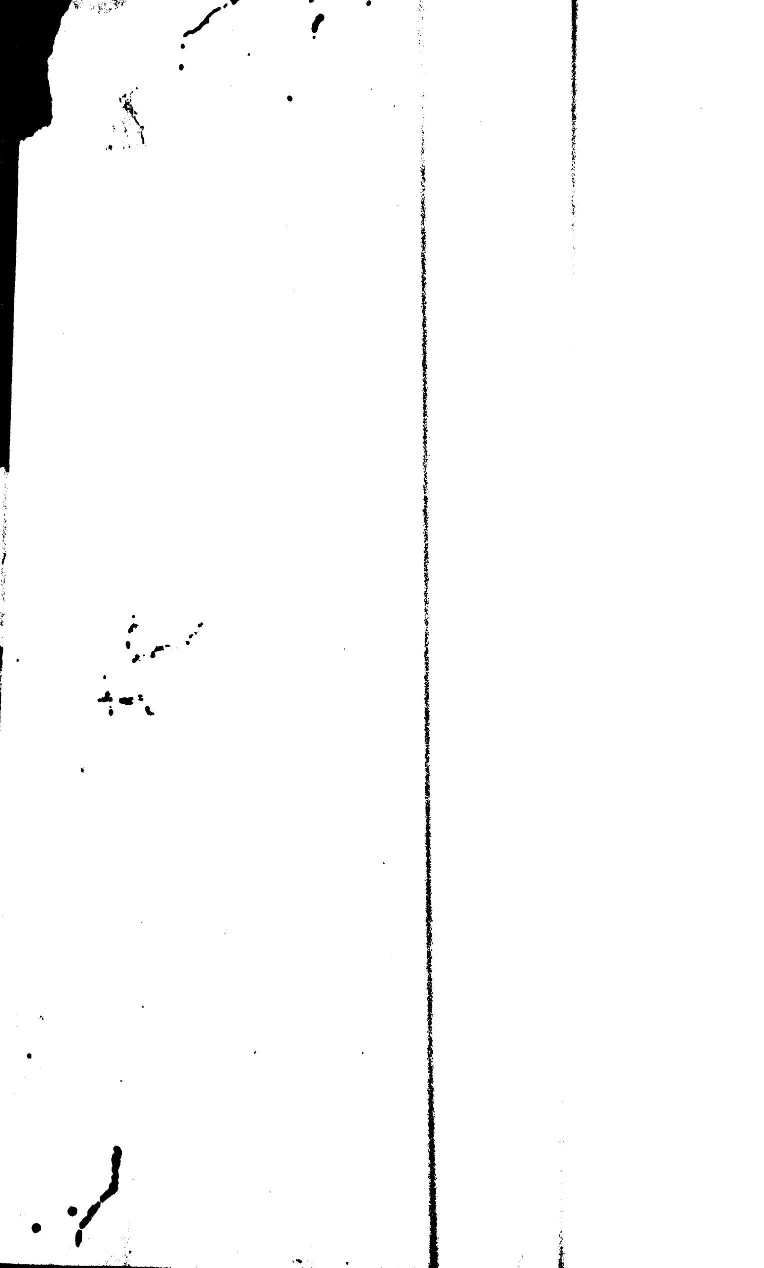
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়



প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ

১৩৩৫

 * [মূল্য ১॥০ দেড় টাকা



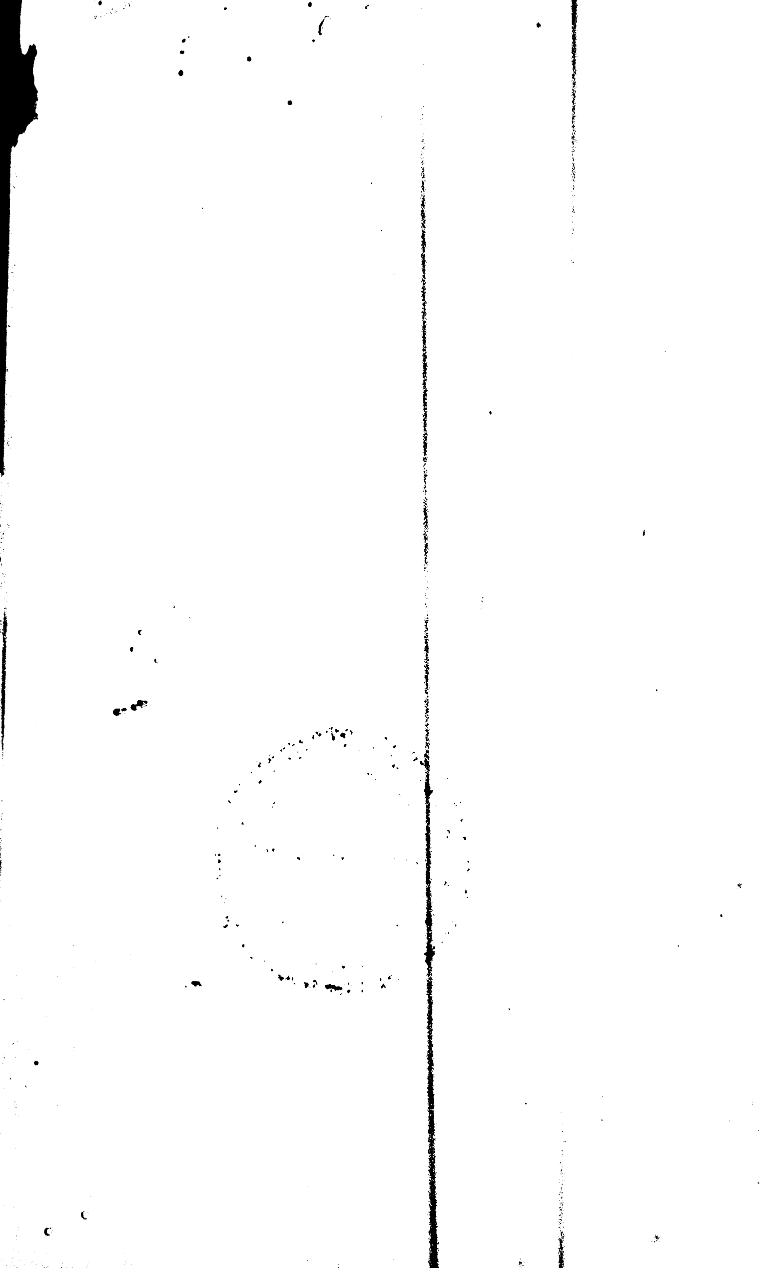


শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

উপহার







নারীমেধ

গুরুদেব তখন বাঁচিয়া ছিলেন—

গুরু-মা বলিতেন, "তোমার অবর্ত্তমানে··· বলতে নেই···আমায় কিন্তু পথে দাঁড়াতে হবে, বুঝতে পারছি।"

হইলও তাই। গুরুদেব হঠাৎ মারা গেলেন। মাসখানেক্ পরেই গুরু-মা তাঁহার ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

ভিক্ষান্নেই দিন চলে।

সে-বছরও অমনি বাহির হইয়াছেন। পথেই বর্ষা নামিয়া পড়িল। বাড়ী ফিরিতে হইলে প্রকাণ্ড একটা নদী পার হইতে হয়। ভীষণ খরস্রোতা নদী। বান না কমিলে নৌকা চলে না। গুরু-মা গুরুতর সমস্যায় পড়িয়া গেলেন।

মনে পড়িল, বাঁকুলিয়া গ্রামের পরাশর ঘোষালের স্ত্রী তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল বহুদিন পূর্ব্বে। কাজেই, কথাগুলা এখন আর তাঁহার ঠিক মনে নাই। মেয়েটির নাম নয়নতারা।

মেয়েটি বন্ধ্যা ; তাহার জন্য খানিকটা আক্ষেপ ত' ছিলই, তাহার উপর একটি ভাইকে সে তাহার কাছে আনিয়া রাখিয়াছে, বিবাহ দিয়াছে,—সুন্দরী বৌ, কিন্তু বরাত এমনি যে, তাহারও গতিক বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না, ছেলেপুলে তাহারও বোধ করি কিছু আর হয় না। এম্‌নি সব নানান্ কথার পর লিখিয়াছিল, ইহার

উপায় কি হইতে পারে বলিয়া দিন্। দয়া করিয়া একবার পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলে বড় ভাল হয়।

পথের একটা লোককে গুরু-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁকুলিয়া এখান থেকে কতদূর বাবা ?"

লোকটা যাহা বলিল, তাহাতে মনে হয়, নিতান্ত কাছে।

বলিল, "বেশি ধূর্ লয় মা-ঠক্‌রাণ, কাছেই বটে !"

বলিয়াই সে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, "হুই যে তালগাছ—হোইখানে একটা গাঁ ; তা বাদে হোই যে কয়লা-খাদের ডাগর-ডাগর চিম্‌নি,—ওইখানে বাঁকুলা।"

বলিল বটে, কিন্তু পথ যেন আর ফুরাইতে চায় না।

কয়লা-কুঠির দেশ। চারিদিকে রেলের লাইন, লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রপাতি, চিম্‌নি আর

ধোঁয়া,—অসমতল প্রান্তরের উপর মাঝে-মাঝে এক-একখানি গ্রাম। গুরু-মা কয়েকবার এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পায়ে-চলার অজানা পথে—এই প্রথম।

বৈকালের দিকে আকাশে আবার মেঘ উঠিল। বাতাস ভারি হইয়া উঠিয়াছে।

বহু দূরের গ্রামগুলা পর্য্যন্ত এতক্ষণ নজর চলিতেছিল; এইবার দৃষ্টির পরিধি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।—অন্ধকার!

কিন্তু বাঁকুলিয়া গ্রাম আর বেশি দূরে নয়।

বহুকালের পুরাতন কয়েকটা কয়লা-কুঠি। কোনোটা চলিতেছে, কোনোটা বা বন্ধ।

বন্ধ খাদের চতুঃসীমায় পা বাড়াইবার উপায় নাই। স্থানে স্থানে ধ্বস্ ছাড়িয়া উপরের মাটি বহু নিম্নে পাতাল-পুরীর অতল গহ্বরে তলাইয়া গেছে। প্রয়োজনের দিনে ইহার চারিদিকে কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া ছিল, রাত্রে লাল রঙের বাতি জ্বলিত,—আজকাল আর সে-সব

কিছুই নাই। খুঁটি-সমেত তারগুলা খুলিয়া লইয়াছে, বাতিও আর জ্বলে না,—লোভের ও লাভের সংগ্রাম শেষ হইয়া গেছে, ধরিত্রীর বুকটাকে ফোঁপ্‌রা করিয়া দিয়া নিষ্ঠুর ব্যবসায়ীর দল উধাও হইয়াছে।

ছোট-খাটো কয়েকটা ঝোপ-জঙ্গলের মাঝ-খানে খোয়া ইটের স্তূপ আর ভাঙা চিমনির নিশান দেখা যায়।

তাহারই পাশ দিয়া সরু একটি পায়ে-চলার কাঁচা পথ অত্যন্ত সাবধানে আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঁচু একটা ডাঙ্গার উপরে গিয়া উঠিয়াছে।—ডাঙ্গার অপর প্রান্তে বাঁকুলিয়া গ্রাম। পরাশরের সাদা ধপ্‌-ধপে দালান-বাড়ীখানি সর্ব্বপ্রথমেই নজরে পড়ে।

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া গুরু-মা গ্রামে পৌঁছিলেন। আকাশের মেঘ তখন কাটিয়া গিয়া আবার চারিদিক্‌ ফর্সা হইয়া উঠিয়াছে পশ্চাতে কোথায় যেন বৃষ্টি হইয়া গেল। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল।

গুরু-মা একা ছিলেন না। সাত-আট বছরের ছেলেটি ত' ছিলই,—সঙ্গে আর একটি মেয়ে,—বয়স প্রায় কুড়ির কাছাকাছি ;—চমৎকার চেহারা।

সদর দরজাটা পার হইয়া আসিয়া উঠান হইতে গুরু-মা ডাকিলেন,—"পরাশর !"

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

উপরের ঘরে মনে হইল কাহারা যেন কথা কহিতেছে। ঘর ঝাঁট্ দেওয়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল।

গুরু-মা আবার ডাকিলেন, "নয়নতারা !"

কথাবার্ত্তা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

"কে গা ?"

কিন্তু আর দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রয়োজন হইল না, জানালার পথে একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়াই নয়নতারা দুম্ দুম্ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

আসিল বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি অতগুলা সিঁড়ি ভাঙিতে গিয়া বেচারা একটুখানি কাৎ

হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না,—হাঁশ্-ফাঁশ্ করিতেই দম যায়।

কিন্তু আগন্তুকদের অভ্যর্থনার ত্রুটি কিছুই হইল না, পিছন দিক্ হইতে আর-একটি মেয়ে আসিয়া আসন আগাইয়া দিল এবং হাত-পা ধুইবার জল আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

নয়নতারা ইতিমধ্যে অনেকখানা সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। চাবি-বাঁধা আঁচলটা গলার কাছে এক ফের্‌তা ফিরাইয়া লইয়া প্রথমেই গুরু-মাকে একটি প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইল।

গুরু-মার সঙ্গে যে মেয়েটি আসিয়াছিল নয়নতারা তাহাকে কোনোদিন দেখে নাই, ভাবিল, বুঝি গুরু-মার মেয়ে। কিন্তু তাহাকে প্রণাম করিতে গিয়া রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। জিভ কাটিয়া দরজার কাছ হইতে মেয়েটি ত' খানিকটা সরিয়া গেলই, গুরু-

মাও হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—"কর কি, কর কি নয়নতারা,—চাষার মেয়ে মা, ও চাষা।"

চাষা!

কিন্তু চাষা বলিয়া চিনিবার জো নাই। নয়নতারা অবাক্ হইয়া একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ডাকিল, "মায়া!"

মায়া তখন উঠানের একপাশে ঘড়্ঘড়ি-দেওয়া কূয়ায় দড়ি-বালতি নামাইয়া জল তুলিতেছে।

নয়নতারা বলিল, "ওই দেখ মা, আক্কেল দেখ মেয়ের! ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, গুরু-মা এলেন—পেন্নাম কর্, পায়ের ধূলো নে আগে, তা না জল তুলতে গেলেন! এতে কি আর ছেলেপুলে হয় কখনও?—আমার না হয় হলো না, কপাল পুড়েছে; তোদের নিয়ে এলাম, বলি, আহা, ভাইটার হোক্, আমার তবু দেখে সুখ!... না মা, ওকে নিয়ে আর হলো না দেখছি—"

বাহিরে জল রাখিয়া মায়া ঘরে ঢুকিল।

নয়নতারা বলিল, "এসো! পেন্নাম কর! ভক্তি করে' পায়ের ধূলো নিতে হয় আগে, তাও জানো না, কচি খুকি!"

গলায় কাপড় দিয়া হাঁটু গাড়িয়া মায়া একটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পর যে-ভুল নয়নতারা করিয়াছে মায়াও সেই ভুল করিতে যাইতেছিল; নয়নতারা নিষেধ করিল। বলিল, "ওকে নয়, ও চাষার মেয়ে।"

মেয়েটিকে সে আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল, চাষার মেয়ে বলিতে আর-একবার চাহিয়া দেখিল।

নয়নতারা বলিল, "দেখছ কি, বসো!" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে শুরু-মার পায়ের কাছে বসাইয়া দিল, নিজেও বসিল। বলিল, "এই দেখ মা, বৌ দেখ!"

ঘোমটাটি মায়ার মাথার উপর দু'-ফেরতা করিয়া তোলাই ছিল, নয়নতারা আরও খানিকটা

তুলিয়া দিয়া বলিল, "কানের এই দুল জোড়াটি, মাথায় ফুল, চিরুণী, কাঁটা, আর গলার এই পাটি-নেক্‌লেস্ হার,—এই ক'টি আমি দিয়েছি। বাইশ ভরি সোণা, তার আবার বানি আছে।... তবে দিলে কি হবে, বৌএর গুণ কিছু নেই।"

গহনার ঐশ্বর্য্য দেখানো শেষ হইলে মায়া তাহার মাথার ঘোমটাটা আবার তুলিয়া লইল।

গুরু-মা বলিলেন, "বেশ বৌ!"

"যার জন্যে আনা, তাই যখন হলো না,—বেশ আর কি করে' মা? পঞ্চুর আবার বিয়ে দেব।"

মায়ার সুন্দর মুখখানির পানে গুরু-মা এক-দৃষ্টে তাকাইয়াছিলেন, নয়নতারার কথা শুনিয়া চোখের পাতা দুইটি তাঁহার সহসা ভারি হইয়া নীচের দিকে নুইয়া পড়িল।

গুরু-মা সস্নেহে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "না, বেশ বৌ!"

বলিয়াই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, "পরাশরকে দেখছি না ত? গেছে নাকি কোথাও?"

নয়নতারা তাহার ঠোঁট দুইটি উল্টাইয়া বলিল, "আ—। থাকে নাকি কোনোদিন ? কয়লা কয়লা করে' ছুটে' বেড়ায়। কারবারী মানুষ থাক্‌লে চলেও না।"

মায়া এইবার মুখ তুলিল। নয়নতারার কানের কাছে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁদের জলখাবার করিগে যাই ?"

নয়নতারা বলিল, "তাই ভাব্‌ছিলাম। ভাব্‌ছিলাম, বলি, বলে কি না দেখি।"

মায়া উঠিয়া গেল।

তখনও দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে কি না সন্দেহ, নয়নতারা বলিল, "অন্য বৌ হলে এতক্ষণ কোন্ ছ্যাঁকে উঠে যেতো !"

চাষার মেয়েটি দরজার কাছে বসিয়াছিল। গুরু-মা বলিলেন, "যা মা ছবি, তুইও যা, বৌমার সঙ্গে, হাতে-পাতে করে' নিগে যা !"

ছবি—!

নামটি বেশ। চেহারার সঙ্গে মানায় ভাল।

নয়নতারা বলিল, "বেশ মেয়েটি। অমনি একটি পেতাম আমি,—মাইনে ভাত-কাপড় দিয়ে রাখতাম তাহ'লে।"

কথাটা শুনিয়া গুরু-মা যেন একটুখানি খুশীই হইলেন। বলিলেন, "লোক চাই তোমার? তা বেশ, ওকেও রাখতে পার।"

নয়নতারাও অনেক দিন হইতে একটি ঝি খুঁজিতেছিল। বলিল, "বেশ মা, ভালই হলো। মাইনে ঠিক করে' তুমি ওকে রেখে যাও তাহ'লে।"

রাস্তা হাঁটিয়া পায়ে এক-পা ধূলা জমিয়াছিল, কথায় কথায় গুরু-মা এতক্ষণ উঠিতে পারেন নাই, এইবার উঠিলেন। জল-ভর্ত্তি ঘটি বাল্তি দুয়ারের কাছে নামানো ছিল। গুরু-মা দেখিলেন, শান-বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বর, এক পাশে লোহার ঘড়্ঘড়ি দেওয়া মস্ত কূয়া, কূয়া-মূলে এক গাদা পায়রা আসিয়া নামিয়াছে, ষষ্ঠীচরণ ইহারই মধ্যে সেইখানে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া পায়রা উড়াইতেছিল।

নয়নতারার সবুর সহিতেছিল না, বলিল, "চল মা চল, তুমি ওই মেয়েটিকে এক্ষুনি বলবে চল—!"

বলিয়া মেঝেতে হাত পাতিয়া তৎক্ষণাৎ সে উঠিতে যাইতেছিল, গুরু-মা ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন; বলিলেন, "ও আমার এক রকম বলাই আছে মা, মেয়েটা কম বয়সে বিধবা হলো,—আমার ঘরের কাছেই ঘর।"

গামছা দিয়া পা মুছিতে মুছিতে তিনি আবার বলিতে সুরু করিলেন, "ঘরে ওর কেউ নেই। একটা ভাই আছে, বারো মাস বিদেশেই থাকে। বোনের খোঁজ-খবর নেওয়া দূরে থাক্, নাম-চিন্তেই করে না। কষ্টের আর অবধি ছিল না মেয়েটার। কেঁদে আমার কাছে এসে পড়লো। বল্লাম, থাক্। এখান-ওখান যাওয়া-আসা ত' করি—ভাল ঘর-টর দেখে রেখে যদি দিতে পারি কোথাও ত' থাকবি।"

নয়নতারা আশ্বস্ত হইল। কথায় কথায় আসল কথাটাই এতক্ষণ তাহার মনে ছিল না;

জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা, গুরু-ঠাকুর মরবার সময় তোমায় কিছু বলে' যান্ নি ?"

গুরু-মা বলিলেন, "কেন বল ত ? কি কথা ?"

কথাটা বলিতে নয়নতারার একটুখানি লজ্জা করিতেছিল, খানিক্ থামিয়া বলিল, "ওই জন্যেই ত চিঠি লিখেছিলাম······আমায় একটি কবচ দেব' বলেছিলেন। সে কবচ নিলে নাকি পড়্তি বয়সেও······হবার ত' আশা-ভরসা কিছুই দেখছিনে মা, তবু একবার নিয়ে দেখতাম।"

নয়নতারার মনের কথাটা এতক্ষণে তিনি বুঝিতে পারিলেন। ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কবচ···না মা, কবচের কথা ত' কিছু বলে' যাননি। তবে আমাদের ষষ্ঠীতলার ফুল একটি তোমায় আমি পাঠিয়ে দেব গিয়ে।"

নয়নতারার চোখ দুইটা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "ষষ্ঠী ! তোমার ষষ্ঠীচরণ বুঝি ওই······তা কবে দেবে ? কেমন করে' পাঠাবে ? কি করে' খেতে হয় ?"

হঠাৎ এতগুলা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া গুরু-মা একটুখানি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "খেতে হয় না মা, একটি মাছুলির ভেতর নিয়ে ভক্তি করে' ধারণ ক'রো। মায়ের কৃপা যদি হয় ত' হতেও পারে।"

এমন সময় ষষ্ঠীচরণ ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মায়ের কাছে আসিয়া কানে কানে বলিল, "আমার ঘুম পাচ্ছে মা, ঘুমোব।"

ছোট ছেলে, অতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, ঘুম পাইবারই কথা। গুরু-মা বলিলেন, "ঘুমো ও ওইখানে।" বলিয়া তিনি ঘরের মেঝেটি দেখাইয়া দিলেন।

"সে কি!"—নয়নতারা কিছুতেই তাহাকে ঘুমাইতে দিল না, বলিল, যেমন হয়েছে ত্'খানা খেয়েই ঘুমোক্। চল মা, দেখি ওরা কি করছে। চল।"

নয়নতারা তাহাদের লইয়া রান্নাঘরে উঠিয়া গেল।

সাঁই সাঁই করিয়া 'ষ্টোভ্' জ্বলিতেছিল।

কলের উনান দেখিয়া ষষ্ঠীচরণের ঘুমাইবার কথাটা আর মনে রহিল না।

হালুয়া তৈরী হইয়া গেছে, ছবি হেঁটমুখে বসিয়া বসিয়া লুচি বেলিতেছিল, মায়া তখন ঘিয়ের কড়াইটা চড়াইবার উদ্যোগ করিতেছে।

নয়নতারা বলিল, "খান্‌-কয়েক ভেজে আগে ষষ্ঠীচরণকে খাইয়ে দাও ত গা। ঘুম পেয়েছে ওর।"

গুরু-মা বসিলেন। বলিলেন, "না মা, তাড়াতাড়ি ক'রো না। কলের উনোন দেখে ঘুম ওর ভেঙে গেছে।"

ষষ্ঠীচরণ উঠিয়া গিয়া গুরু-মার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা, কেমন করে' জ্বালে ওটা ?"

গুরু-মা নিজেই জানিতেন না। বলিলেন, "কেমন করে' জানব বাছা,—আবার জ্বালবে যখন তখন দেখো।"

নয়নতারা বলিল, "জ্বেলে আমি দেখাব এখন। এ-সব আমার ভাইএর সখ। বললে, দে দিদি কুড়িটা টাকা, একটা আশ্চয্যি জিনিষ আনিয়ে দিই। তারপর বিলেত থেকে না কোত্থেকে আনালে এইটা।"

বলিয়াই সে একবার ছবির দিকে, একবার গুরু-মার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। ইচ্ছা, যে, এখনই তিনি তাহাকে এখানে থাকিবার কথাটা বলেন।

গুরু-মা টের পাইলেন, বলিলেন, "ছবি, তুই থাক্ এইখানে। খাবি, পরবি, তিন চার টাকা মাইনে পাবি। মন্দ কি?"

ছবি তাহার কালো ঢল্‌ঢলে' হরিণের মত চোখ দুটি তুলিয়া গুরু-মার মুখের পানে একবার তাকাইল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া হেঁটমুখে আবার তাহার কাজ করিতে লাগিল।

*   *   *   *

আলো আনিতে গিয়া মায়া হোঁচট্ খাইল। নয়নতারা কিছুই বলিল না।

ষষ্ঠীচরণকে খাওয়াইয়া দিয়া বলিল, "যাও, তোমরা দোতালায় যাও! ষষ্ঠীচরণকে শুইয়ে দিয়ে বিছানা করে' নাও গে।"

মায়া একা গেল না, ছবিও সঙ্গে গেল।

ষষ্ঠীচরণকে নিজের খাটের উপর শোয়াইয়া দিয়া ছবিকে লইয়া মায়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

অনেক দিন পরে মায়ার মুখে আজ হাসি ফুটিল বলিয়া মনে হয়। হাসিয়া বলিল, "বেশ হলো ভাই, থাকো তুমি। তবু মাঝে-মাঝে কথা কয়ে বাঁচব।"

ছবিকে সে যেন দাসী চাকরাণী বলিয়া ভাবিতেই পারিল না।

ছবিও হাসিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "থাক্‌ব।"

আলাপ পরিচয় জমিয়া উঠিতে বেশি দেরি হইল না। অনেক দিনের পর কথা কহিতে পাইয়া মায়া আজ অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। সে যে গরীব লোকের মেয়ে, বড়লোকের বাড়ী সুখে থাকিবে ভাবিয়া বাবা তাহার এখানে বিবাহ দিয়াছিলেন,—এই কথাটাই ছবিকে সে অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়া বলিল। বলিল, "ভাত-কাপড়ের সুখ আর চাইনে ভাই, স্বামীর সুখও যথেষ্ট পেয়েছি,—এইবার একবার ছাড়া পেলেই বাঁচি।"

ছবি কিন্তু একটি কথাও কহিল না। জানালার কাছে তাহার পায়ের গোড়ায় হেঁটমুখে বসিয়া রহিল মাত্র।

কথার শেষে চোখ দুইটি তুলিয়া সে একবার মায়ার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু বাহিরে তখন মেঘাবৃত সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ক্রমশ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, মুখখানিও বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল না।

সিঁড়ির উপর চটি জুতার শব্দ শুনিয়া মায়া বলিল, "বাবু এলেন।"

ছবি ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, মায়া তাহার হাতে ধরিয়া নিরস্ত করিল। চুপি চুপি বলিল, "বসো। আসবে না। ও-ঘরে আলো আছে।"

কিন্তু চটির শব্দ ও-ঘরে ঢুকিয়াই আবার বাহির হইয়া আসিল। এ-ঘরের সুমুখ দিয়াও একবার পার হইয়া গেল। খাটের আড়ালে অন্ধকারে যে মানুষ বসিয়া আছে, বাহির হইতে কিছুই সে টের পাইল না।

খানিক বাদে পঞ্চু পাশের ঘর হইতে 'দিদি দিদি' করিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

রান্নাঘর হইতে দিদি বলিল, "যাই—।"

●

গুরু-মাকে সেইখানেই বসাইয়া রাখিয়া হাঁশ্-ফাঁশ্ করিয়া নয়নতারা উপরে উঠিয়া আসিল।

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া দেখে, সাদা ধপ্‌ধপে বিছানার উপর কালো অঙ্গ বিছাইয়া হাত-পা ছড়াইয়া পঞ্চু তাহার ভুঁড়ি নাচাইতেছে, আর খাটের এক পাশে মেঝের উপর দুই কানে দুইটা হাত দিয়া ষষ্ঠীচরণ নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

দিদি ঘরে ঢুকিয়াই ষষ্ঠীচরণের দুরবস্থা দেখিয়া একটুখানি শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।— "এ কিরে? এ কি? এ যে……"

পঞ্চু বলিল, "বিছানার ওপর শুয়েছিল—কে এ ব্যাটার-ছেলে লবাব?"

"ওরে থাম্ থাম্—গুরুঠাকুরের ছেলে আমাদের। গুরু-মা এসেছেন। আয়, আয়, পেন্নাম করবি—আয়, পায়ের ধূলো নিবি আয়!"

"পায়ের ধূলো? কাল নিলে হবে না?—এই!"

নয়নতারাকে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ হাত দুইটি কান হইতে সরাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু আবার অতর্কিতে আর-এক চড় খাইয়া ভয়ে-ভয়ে সে তাহার হাত দুইটি কানের কাছে তুলিতে গেল;

নয়নতারা তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, "বৌটার মত বজ্জাত মেয়ে আমি দেখলাম না ছুনিয়ায়। কেন বাপু, জানিস্ তুই—পঞ্চু আমাদের রাগী মানুষ,—তবু ইচ্ছে করে'......কেন, ওইখানে আর একটা বিছানা করে' দিলেই ত হতো। বৌ! বৌ! অ বৌ! কোথায় গেলেন তাঁরা ?"

নয়নতারা আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একটি ঝি রাখলাম পঞ্চু, দেখবি ?—বেশ ভাল মেয়ে—গুরু-মার সঙ্গে এসেছে,—চাষার মেয়ে।"

নয়নতারার ডাক শুনিয়া ছবিকে সঙ্গে লইয়া মায়া তখন ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া চুপি চুপি নীচে নামিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

নয়নতারা ডাকিল, "ছবি! শোনো ত' মা!"

অন্ধকার বারান্দার উপর ছবি থমকিয়া দাঁড়াইল।

নয়নতারা তাহার হাতে ধরিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া পঞ্চুর সুমুখে দাঁড় করাইয়া দিল। বলিল, "এই দেখ্—!"

ঝি না ঝি,—পঙ্কু প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু আড়্‌চোখে ছবির মুখখানা দেখিবামাত্র সে তড়াক্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। আঙুল বাড়াইয়া বলিল, "দে ত' দিদি সিগ্‌রেটের বাক্সটা—ওই যে ওই সাদা জামাটার পকেট থেকে!"

তাহার পর একটি সিগারেট মুখে দিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "দোকানদার বেটা বলে কি জানিস্ দিদি, বলে, ছু'পয়সায় একটি সিগ্‌রেট্‌—এ এক আপনি ছাড়া এ গাঁয়ে আর কেউ খায় না।"

বলিয়াই সে একবার নয়নতারার দিকে, একবার ছবির দিকে তাকাইয়া ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ঘোড়ার মত মুখ, কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা,—নয়নতারার ভাই বলিয়া চেনাই যায় না,—মায়ার স্বামী বলিয়া ভাবিতে কষ্ট হয়।

মায়া বোধ করি বাহিরের অন্ধকারে তখনও

দাঁড়াইয়া ছিল, ঝুন্ করিয়া চুড়ির শব্দ হইতেই ছবি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

পঞ্চু বলিল, "চল্ দিদি চল্, দেখি তোর গুরু-মা কেমন, একটা পেন্নাম্ ঠুকেই আসা যাক্—চল্।"

দিন-দুই পরে সংবাদ পাওয়া গেল, নদীর খেয়াঘাট খুলিয়াছে, নৌকা চলিতেছে এবং সম্প্রতি আশঙ্কার কোনও কারণ নাই।

চারটি টাকা প্রণামী দিয়া নয়নতারা গুরু-মার পায়ের ধূলা লইল।

পঞ্চু বলিল, "হাতীর মত গরু আমাদের, ঘোড়ার মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে।—কতক্ষণ!"

গরুর গাড়ী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

গুরু-মা বলিলেন, "ষষ্ঠী-মায়ের ফুল আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব।"

ছবিকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "কোনও ভয়-ভাবনা নেই মা তোর, ভাল করে' থাকিস্ যেন। মাঝে-মাঝে চিঠি-পত্তর দিস্।"

ছবি প্রণাম করিতেই গুরু-মা গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিলেন। ষষ্ঠীচরণ আগেই তাহার জায়গা দখল করিয়াছিল।

পথের বাঁক্ ফিরিতেই গাড়ীখানা আর দেখা গেল না। হাতীর মত গরু বোধ করি ঘোড়ার মতই উড়াইয়া লইয়া গেল। গুরু-মা বিদায় হইলেন।

এইবার গল্প স্বুরু।

পঞ্চু মুখে কিছু বলে না, আড়-চোখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে, আর জানোয়ারের মত ছোট ছোট চোখ তুইটা তুলিয়া মিট্ মিট্ করিয়া তাকায়।

এ-সব যে একেবারে নিরর্থক তাহা নয়, ছবি সবই বুঝিতে পারে ; হয় সেখান হইতে পালায়, নয় ত' পিছন ফিরিয়া বসে।

উপরের বারান্দায় ছবি সেদিন ঝাঁট দিতেছে, পঞ্চু খালি পায়ে উপরে উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশ দিয়া হাঁটিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

ছবি সরিয়া যাইতেছিল, পঙ্কু বলিল, "সরতে হবে না, ভাসুর নই।"

বলিয়াই হাসিল। হাসিয়া সে তাহার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়া মাথার চৌকাঠটা ডান হাত দিয়া ধরিয়া আবার পিছন্ ফিরিল। বলিল, "বিয়ে হয়েছিল,—তোর গয়না কই ছবি? দেয়নি বুঝি?"

তাড়াতাড়ি ঝাঁট দিতে দিতে বাঁ হাত দিয়া পিঠের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া লইয়া ছবি শুধু হেঁটমুখে নীরবে একবার ঘাড় নাড়িল।

পঙ্কু বলিল, "আমার ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দিসে দেখি!—এই! এই ছবি!"

ঝাঁটাটা সেইখানে ফেলিয়া দিয়া ছবি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

নয়নতারা চৌকির উপর বসিয়া তোলা-উনানে কড়াইএর দুধ নাড়িতেছিল, ছবি মুখ ভারি করিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল, "দেখ দিদি, পঙ্কু বাবু—"

কথাটা তাহার শেষ হইতে পাইল না,

নয়নতারা চোখ তুইটা তাহার বড় করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "পঞ্চুবাবু কি লা, পঞ্চুবাবু কি! দাদাবাবু বল্!"

কিন্তু আর কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া ছবি দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া নয়নতারা বলিল,—"কি—?"

ছবি বলিল, "দাদাবাবু আমায় যা-তা বলছে—।"

নয়নতারা সজোরে বারকতক্ ঘাড় নাড়িল।—"উঁহু! নাঃ! পঞ্চু সে ছেলেই নয়।"

সিঁড়ি পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া পঞ্চু বোধ করি কথাগুলা শুনিতেছিল। এইবার সাহস পাইয়া সেইখান হইতে সে বলিয়া উঠিল, "দেখ্লি দিদি, ঝাঁট দিচ্ছিল, বললাম, ঘরটা নোংরা হয়েছে, যাবার বেলা আমার ঘরেও এক হাত দিয়ে যাস্। যেই বলা, আর দুম্ দুম্ ক'রে সিড়ি ধরে' নেমে এলো।"

ছবি তখনও হেঁটমুখে দাঁড়াইয়াছিল। নয়নতারা

বলিল, "যা, আর বেশি বাড়াবাড়ি করিস্‌নে। রান্নাঘরে বাঁটাঘষা করে' দিগে যা!"

মায়া রান্না করিতেছিল উনানে তখন তরকারি চড়িয়াছে।

দিন সাত আট পরে, সেদিন বৈকালে মায়ার হঠাৎ কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

নয়নতারা বলিল, "এই ছুতো নিয়ে কদ্দিন যে পড়ে থাকবেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তার চেয়ে ডাক্তার ডাক্‌ পঞ্চু!"

গাঁয়েই ডাক্তার। বিদেশী মানুষ। ছোক্‌রা বয়সে কয়লা-কুঠির ডাক্তার হইয়া আসিয়াছিলেন। এখন বয়স হইয়াছে। মেয়ে ছেলে আনিয়া এই গ্রামেই ঘর-বাড়ী তুলিয়া সংসার পাতাইয়াছেন।

পঞ্চু তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কপালে অডিকোলন্‌ আর

জলের পটি দিতে হইবে সারারাত,—আর চার প্রহরে চার দাগ ঔষধ।

লোকের অভাবে সেদিন আর হাঁড়ি চড়িল না। অতিকষ্টে একটা তরকারি করিয়া খানকতক্ লুচি ভাজিয়া নয়নতারা একেবারে নাকাল হইয়া পড়িল। নিজে খাইয়া, পঞ্চুকে খাওয়াইয়া, ছবিকে বলিল, "খেয়ে নিস্। আমি আর পারিনে বাবা, শুইগে যাই।"

কিন্তু শুইবার আগে নয়নতারা একবার মায়াকে দেখিতে আসিল। গায়ে মাথায় হাত দিয়া বলিল, "তোরা দুজন রইলি, ওষুধপত্র ঠিক ঠিক খাওয়াস্ পঞ্চু! কালকেই যেন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।"

বলিয়াই সে পান চিবাইতে চিবাইতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। হাঁকিয়া বলিল, "দরকার হলে জাগাস্!"

পঞ্চু ত' করিল সবই! ঘুমাইল না, কিন্তু ঘরের এক কোণের দিকে মাদুর বিছাইয়া চুপ

করিয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রি জাগিয়া ছবিই মায়ার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

ঘড়িতে তখন প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। ঘুমের ঘোরে ছবি ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছিল, পঞ্চু তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যা তুই—ঘুমোগে যা, এবার আমি বসি।"

ছবি ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নয়নতারার ঘরে খিল পড়িয়াছে, নীচের ঘরগুলা চাবিবন্ধ, কাজেই বারান্দা ছাড়া আর উপায় নাই।

বারান্দাটাও অন্ধকার। জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ ডুবিয়া গেছে। ঘুমে তখন তাহার চোখ দুইটা জড়াইয়া আসিয়াছিল।

ভাবিল, আসুক্ ঘুম, তবু সে চোখ রগ্ড়াইয়া কোন রকমে জাগিয়া থাকিবে। রাত্রি আর কতক্ষণই বা আছে! কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝর্‌ঝরে সিমেণ্ট-দেওয়া মেঝের উপর শুইয়া অতরাত্রে জাগিয়া থাকাও দায়।

সহসা তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু নিরুপায়···!

নিস্তব্ধ রাত্রি—

চারিদিক্ অন্ধকার—

ঘরের ভিতর হইতে রোগীর আর্ত্তকণ্ঠ শোনা যায়···

চেঁচাইবার উপায় নাই। মুখে কাপড় চাপা!

এ কি নৃশংস অত্যাচার!

নিঃসহায় নারী আর ক্ষুধার্ত্ত জানোয়ার!

ছবির সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল।

সমস্ত অঙ্গ তাহার ধীরে-ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

তাহার পর—

আর কোনও কথা নয়।

রক্ত-মাংসের মানুষ। পুরুষ ও নারী···

দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিতে লাগিল।

*　　　*　　　*　　　*

মায়া সারিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু শরীরটা যে তাহার কেন ভাঙিয়া গেল কে জানে!

মাঝে-মাঝে জ্বর হয়। ঔষধ খাইতে চায় না। বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে। আবার ঝাড়াঝুড়ি দিয়া সারিয়া ওঠে। উঠিয়াই স্নান করিয়া হেঁসেলের কাজে লাগিয়া যায়। শরীরের উপর অযথা অত্যাচার চলিতে থাকে।

পঞ্চু হাসে। বলে, "দিন দিন চেহারা যে তোমার···"

মায়া কথা বলে না।

নয়নতারা বলে, "পঞ্চু, একটু ভালবাসে তাই, নইলে কোন্‌দিন ভাইয়ের আবার বিয়ে দিতাম।"

মায়া এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মুখের উপর না বলিলেও আড়ালে গিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া জবাব দেয়, "দাও না, বারণ ত' করিনি।"

রাগে নয়নতারা কট্‌মট্‌ করিয়া তাকায়।

বলে, "সোয়ামীর আদর-সোহাগ পেয়ে পেয়ে গরব তোর বাড়লো দেখচি।"

পরাশর দু'চার দিনের জন্য গ্রামে আসে। পাতলা খিড়্‌খিড়ে হাড্ডিসার মানুষ। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং। টাকা টাকা করিয়া আসে, আবার টাকা টাকা করিয়া চলিয়া যায়।

বলে, "মাড়োয়ারী-বেটারা কি বজ্জাত! পাঁচটি হাজার টাকা আদায় করতেই পাঁচটি মাস।"

নয়নতারা বলে, "তুমি বলেই পার, আর-কেউ হ'লে..."

"আর কেউ হ'লে—" পরাশর হাসিতে হাসিতে বলে, "সাত ঘাটের জল খেতো।"

পরাশর বলে, "পঞ্চুর বৌএর শরীর ত' দেখচি...কই, জ্বর-জ্বালা ত' আগে ওর হতো না!"

নয়নতারা বলে, "ওর কথা আর বলো না! তাও ভাগ্যিস্ ওই চাষার মেয়েটি রেখেছিলাম,

নইলে খেটে খেটে আমিও হয়ত আধখানা হয়ে যেতাম।”

না খাটিয়া সে যে কতখানি হইয়াছে, পরাশর তাহার বপুখানির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখে। বলে, “ঝরুক্ না একটুখানি।”

হাসিয়া সোহাগ করিয়া নয়নতারা তাহার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়ে। হাড় ক’খানা শক্ত, তাই ভাঙে না। বলে, “খাওয়া ত’ এক রকম ছেড়েই দিয়েছি। কি করব বল! ভগমানের হাত।”

মায়া চা তৈরী করিয়া ছবির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। দরজার কাছে গলার শব্দ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া হেঁট মুখে চায়ের পেয়ালা দু’টি নামাইয়া দিয়া ছবি বাহির হইয়া গেল। পরাশর একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

নয়নতারা বলিল, “দেখ্‌ছ কি? চা খাও!”

পরাশর হাসিয়া একবার নয়নতারার মুখের পানে তাকাইয়া চায়ের বাটিটা তুলিয়া লইল।

গাঁয়ে-ঘরে প্রতিবেশী দু'চারজন আসিয়া বসে। কোনও কাজ না থাকিলে—অন্তত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইলেও, ইহার-উহার মিষ্টি-মধুর দু'চারটা নিন্দাবান্দাও করিয়া যায়। কিন্তু নয়নতারার অতবড় ঘর, তবুও কেহ আসিতে চায় না। আড়ালে-আব্ডালে কানাঘুষা করে। বলে, "চামার মাগী; কার জন্যে যে ধন জোগাচ্ছে মা কে জানে!"

ঘরখানা দিনরাত ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। নয়নতারা অত-সব গ্রাহ্যও করে না। ভা'জ-বৌকে লইয়া উড়ন্-পাড়ন্ চলে।

ছ'টিমাস দেখিতে দেখিতে জলের মত কাটিয়া গেল।

ছবির রূপ আজকাল যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফাটিয়া পড়ে। যৌবনের সে চটুলতা আর নাই। স্নিগ্ধ শান্ত একটি অনবদ্য সৌন্দর্য্য যেন

তাহার সমস্ত দেহটিকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

মায়াকে নয়নতারা যখন-তখন বলিতে সুরু করিয়াছে, "দেখ্‌লো দেখ্‌! আমার ঘরের ভাত-কাপড়ের গুণ দেখ্‌! আর তোকেই কি না সুখে খেতে ভূতে কিলোলো!"

এক একদিন মায়া দেখে—

সদ্য স্নান করিয়া আসিয়া কালো কালো এক পিঠ চুল এলাইয়া দিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া ছবি দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাতের রৌদ্র তাহার গায়ে-মুখে যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে।

মায়া একদৃষ্টে গোপনে ঘরের ভিতর হইতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে।

অনেক দিন হইতে সে আর তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে না। তবু একবার ইচ্ছা করে, ডাকিয়া শুধায়।

ভাত-কাপড়ের অভাব ত' অনেকেরই থাকে না, রূপের গৌরবও ত' অনেকেই করিতে পারে,

কিন্তু,—ওইখানেই কি শেষ? জীবনের মূল্য কি আর কোথাও কিছুই নাই?

মুখে রোদ লাগিতেই ছবি হঠাৎ মুখ ফিরাইল।

মুখের উপর কেমন যেন একটা দুঃখের ছায়া। ইহাই যেন সে দেখিতে চাহিয়াছিল। ডাকিল, "ছবি!"

ছবি ধীরে-ধীরে শুষ্কমুখে অপরাধীর মত ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

মায়া বলিল, "অমন মন-মরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?"

ছবি মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিল না। হেঁট মুখে খাটের এক পাশে দাঁড়াইয়া বিছানার চাদরটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমি একবার বাড়ী যাব। তাই ভাবছি।"

"বাড়ী? বাড়ীতে তোর কেউ নেই বলেছিলি না?"

ছবি বলিল, "দাদা আছে। আমি যাব।"

শেষের কথাটা সে এমনি ভাবে উচ্চারণ করিয়া মুখ নামাইল, মনে হইল এখনই যেন সে কাঁদিয়া ফেলিবে।

মায়া আর কোনও প্রশ্ন করিল না। কেন যাইবে, কখন যাইবে, কতদিনের জন্য যাইবে, অন্য সময় হইলে এ-সব কথা মায়া তাহাকে এক-বার জিজ্ঞাসাও করিত। কিন্তু এখন আর নিজের দিক্ দিয়া কাহাকেও কোনও প্রশ্ন করিবার স্পৃহা তাহার নাই! যে থাকে সে থাক্,—যে যায় সে যাক্,—নিজের বঞ্চনার দুঃখ তাহাতে এতটুকুও কমিবে বলিয়া তাহার মনে হয় না।

এখানে যখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল মা না থাকিলেও বাবা তাহার বাঁচিয়া ছিলেন। বলিয়া-ছিলেন, মেয়ের আমার রূপ আছে, গুণ আছে, বড় লোকের বাড়ী বিবাহ দিলাম, ভাত-কাপড়ের অভাব কোনোদিন হইবে না, আর কি চাই?

নয়নতারাও সেই কথা বলে।

ছবিও যে বলিবে—তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি !

আরও দশ জনের মুখে ওই এক-কথাই সে বলিতে শুনিয়াছে।

হয়ত তাই।

কিন্তু অসুখের দিনে প্রচুর অবসর পাইয়া এই কথাই সে অনেক রকম করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে,—মন তাহার কোনও রকমেই তাহা স্বীকার করিতে পারে নাই।

ছবি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, মায়া বলিল, "ভিজে মাথায় দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে ছবি, চুলগুলো শুকিয়ে নিগে যা।"

বলিয়াই তাড়াতাড়ি সে একটা বালিস টানিয়া লইয়া খাটের কিনারে তল্‌পেটটা চাপা দিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

অসুখের পর হইতে মায়ার এই একটা নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পেটে একটা অসহ্য ব্যথা ওঠে, ব্যথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তখন সে এমনি করিয়াই হাতের কাছে

যাহা পায় তাহাই চাপিয়া ধরিয়া যাতনাটা সাম্‌লাইবার চেষ্টা করে।

ছবি ছাড়া আর কেহ তাহা জানিত না। অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে ধীরে-ধীরে সে কহিল, "দিদিকে ডেকে দেব?"

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া পাগলের মত মায়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "না, না, না, না,—ওঃ!"

বলিয়া সে তাহার দাঁতে দাঁত চাপিয়া দুই হাতের দশটা আঙুল দিয়া প্রাণপণে বিছানার চাদরটাকে টানিয়া টানিয়া জড়ো করিতে লাগিল।

ছবি বলিল, "আমি বাড়ী যাব, দিদি!"

আর কিছু সে বলিতে পারিল না, গলার আওয়াজটা ভারি-ভারি ঠেকিল।

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? বাড়ী কেন হঠাৎ?"

ছবি বলিল, "হুঁ, আমি যাব।"

পঙ্কু বোধ করি সিঁড়ি দিয়া উপর হইতে নীচে

নামিতেছিল, অন্ধকারে হঠাৎ পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "তাই যাস্ বাপু, যাস্। ফিরবি কবে ?"

ছবি তাহার দিকে না তাকাইয়া বলিল, "পাঁচ দশ দিন..."

পঞ্চু ছুটি মঞ্জুর করিয়াছে, তাহার উপর আর কথা চলে না; তবু নয়নতারা একবার বলিয়া দেখিল, "কিন্তু হাঁ রে পঞ্চু, এ সময় মায়ার শরীর অম্নি, তার ওপর ও-ও যদি চলে' যায়—"

পঞ্চু সিগারেট টানিতে টানিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মায়ার আবার হয়েছে কি ? কিস্সু হয়নি। ক'টা দিন নাও কোন রকমে চালিয়ে—আহা, ছ'মাস বাড়ী যায়নি, মন কেমন করে ত ?"

আনন্দে ঈষৎ হাসিয়া নয়নতারা বলিল, "পঞ্চু কারও কষ্ট দেখতে পারে না; জানি যে, ও আমাদের গুষ্টির স্বভাব।"

পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল, "তা তুই যাবি কার সঙ্গে ?"

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

ছবি বলিল, "আপনি যদি এই খেয়াঘাট পর্য্যন্ত—তারপর আমি একাই—" বলিয়া জানালার একটা শিক্ ধরিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত ছবি একবার পঞ্চুর মুখের পানে তাকাইল।

পঞ্চু বলিল, "আমি? তা আমি—আমায় কেন বাপু, আর-কেউ—আচ্ছা, দেখা যাবে তাই সময় যদি পাই ত'—আচ্ছা দেখা যাবে।"

বলিয়া কথাটাকে তেমন আমল না দিয়াই চটি চট্‌পট্ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া পঞ্চু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিন হইতে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চু তাহার চোখে একটা কালো রঙের ঠুলি-দেওয়া ডাগর চশমা পরিয়া ছাতা হাতে লইয়া বলিল, "চল্!"

ছবি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, নয়নতারার দেওয়া

বারোটি টাকা খুঁটে বাঁধিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাহার পিছন ধরিল।

পঞ্চু কিন্তু বাড়ী ফিরিল রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের পর।

মায়া কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিল না।

নয়নতারা বলিল, "এত দেরি যে?"

পঞ্চু বলিল, "বাপ রে বাপ্! দিয়ে এলাম সে খেয়াঘাট পেরিয়ে অনেক দূর।"

"তাইত রে—অতখানা পথ" নয়নতারা বারে-বারে বলিতে লাগিল, "অত বড় সোমত্ত মেয়ে—একা যাবে—!"

পরদিন বেলা তখন প্রায় একটা বাজে।

কয়েকদিনের অনাবৃষ্টিতে মাটি আবার তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে আগুনের হল্‌কা বহিতেছিল। উন্মুক্ত মাঠের উপর রৌদ্রের ঝিলিমিলি।

ঘোড়ায় চড়িয়া ডাক্তারবাবু ভিন্ন গ্রামের

ডাকে গিয়াছিলেন। কাঁকর-পাথরে হোঁচট্ খাইয়া খাইয়া ঘোড়াটা একেবারে হায়রাণ হইয়া পড়িয়াছে। লোহার শিকল-পরা মুখের দুই চোয়াল বাহিয়া সাদা সাদা ফেনা গড়াইতেছিল।

ডাঙ্গাল-পাড়ার কোঁড়াদের কয়েকটা ছেলে পথের মাঝেই ডাক্তারকে আট্কাইয়া ফেলিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা নিম গাছের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

ছেলেগুলা জানাইল, তাঁহাকে একবার এই পথেই একটা রোগী দেখিতে যাইতে হইবে। বেশি দূরে নয়—ওই যে অদূরে মাঠের মাঝখানে পুরানো কয়লা-খাদের ভাঙা চিম্নি আর ইঞ্জিন-ঘরটা দেখা যাইতেছে, তাহারই পাশে কয়েকটা শ্যাওড়াগাছের নীচে একজন রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছট্ফট্ করিতেছে, এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাইতেই হইবে। ঘোড়া যদি তাঁহার না চলে, তাহারা এই ক'জনে

মিলিয়া তাঁহাকে কাঁধে-পিঠে করিয়া লইয়া যাইতেও প্রস্তুত, এবং সেজন্য তাহারা নাকি রোগীর কাছ হইতে নগদ একটি টাকা বক্‌শিশ্ পাইয়াছে।

ডাক্তারবাবু ভাল মানুষ। সহজেই রাজি হইলেন। ঘোড়ার উপর আবার চড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "চল্ !"

ঘোড়ার আগেই ছেলেগুলা মাঠের উপর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া সেইখানে গিয়া হাজির হইল।

রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের উপর আল্-মাঠ ডিঙাইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ডাক্তারবাবু পশ্চাতে গিয়া পৌঁছিলেন।

কিন্তু ঘোড়া হইতে নামিয়াই তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইবারই কথা।

দেখিলেন, আলুলায়িতকেশা পরমা সুন্দরী এক নারী—দেখিলে ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়াই

মনে হয়—অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় সেই ছায়ালেশহীন শুক্‌নো পাথরের ডাঙ্গার উপর গড়াগড়ি দিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কাঁকরে পাথরে সর্ব্বাঙ্গ তাহার ছড়িয়া গেছে, সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের চামড়ায় আঁচড় লাগিয়া রক্ত ফুটিয়া জায়গায় জায়গায় লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তারবাবু কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জল! জল! বলিয়া পাগলের মত মেয়েটা একবার চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং গড়াইয়া গড়াইয়া একটুখানি আগাইয়া আসিয়া ডাক্তারবাবুর পা দুইটা সে দু'হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "বাঁচান! আমায় বাঁচান বাবু!"

দেখিলে কষ্ট হয়। ডাক্তারবাবু বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "কি হচ্ছে মা তোমার?"

"আমার?" মেয়েটি উপুড় হইয়াছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল; শ্যাওড়াগাছের তলায় যে ছায়াটুকু পড়িয়াছিল সেটুকু ছায়াই নয়; তবু সে গরম মাটি হইতে সেইদিকে একটুখানি সরিয়া গিয়া

বলিল, "জ্বলে গেল—ভেতরটা আমার পুড়ে গেল বাবু।"

কিন্তু ইহার কারণ যে কি হইতে পারে, এবং মেয়েটি এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে আসিলই বা কেমন করিয়া, কোথায় বাড়ী, কেন আসিয়াছে,—কিছুই না বুঝিতে পারিয়া ডাক্তারবাবু একটু-খানি মুস্কিলে পড়িলেন।

মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ওই দেখুন!... দেখে আসুন ওইখানে!"

বলিয়াই সে হাত বাড়াইয়া অদূরে কি যেন দেখাইয়া দিল।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, সেইদিক পানে চাহিতেই নজরে পড়িল, কাছেই একটা পাথরের পাশে কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। উঠিয়া কাছে গিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বিড়ালের ছানার মত কি একটা জিনিষ—শুকাইয়া কাঠ হইয়া পড়িয়া আছে; সর্ব্বাঙ্গে তাহার পিপড়া ধরিয়াছে। জুতা দিয়া একটুখানি নাড়িয়া

দিতেই পিপড়াগুলা ঝরিয়া পড়িল। তখন স্পষ্ট দেখা গেল, নিতান্ত খর্ব্বাকৃতি অপরিণত একটি মানব-শিশু,—একান্ত অনিচ্ছায় নিতান্ত অবেলায় হত্যা করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে; চার-পাঁচ মাসের বেশি নয়; ভ্রূণের মধ্যে মুখ-চোখ আকার-প্রকার তখনও ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে নাই।

ডাক্তারবাবুর সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বুঝিতে তাঁহার আর কিছু বাকি রহিল না।

কণ্ঠস্বর সহসা তাঁহার একটুখানি রুক্ষ হইয়া উঠিল। মেয়েটির কাছে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে,—কে করলে এ কাজ শুনি? কোত্থেকে এলে তুমি?"

মেয়েটি কাঁদিতেছিল। মুখ তুলিয়া অতি-কষ্টে কাপড়-চোপড় সামলাইয়া, উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; কাঁপিতে কাঁপিতে আবার তেমনি শুইয়া পড়িয়া বলিল, "পঞ্চুবাবু—এ সর্ব্বনাশ আমার···পঞ্চুবাবু···"

জিব দিয়া ঠোঁট দুইটা একবার চাটিয়া লইয়া মেয়েটি আবার বলিল, "ঝি ছিলাম—ওদের বাড়ী ঝি ছিলাম। ছবি··· আমার নাম ছবি···।"

ছবি থামিল না। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে অস্পষ্টভাবে একে একে সব কথাই বলিয়া ফেলিল। ডাক্তারবাবু শুনিলেন।

বলিল, যাহা হউক একটা কিছু প্রতিকার করিতে বলায় পঞ্চু নাকি কাল বৈকালে তাহাকে এইখানে লইয়া আসে। জীবনে কোঁড়া আর এক মাগী ধাইয়ের সঙ্গে আগে হইতেই কথাবার্তা সব ঠিক হইয়াছিল।

ওই যে ওখানে, পুরানো কয়লা-খাদের ভাঙা একটা ইঞ্জিন-ঘরের তিন পাট্‌ দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহারই ভিতর কি করে যে তাহাদের গত রাত্রিটা কাটিয়াছে তাহা

4

একমাত্র সে-ই জানে। জীব্‌নে কোঁড়া ও ধাই-মাগী টাকা লইয়া ঔষধ দিয়া ছেলেটাকে নষ্ট করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে; আর কিছুই তাহারা করিতে পারে নাই।

পঞ্চুও কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত এখানে ছিল। সকালে আসিব বলিয়াও আর আসিল না। রাত্রে যন্ত্রণা যখন তাহার খুব বেশি হয়, ছবি নাকি ডাক্তারকে খবর দিবার জন্য পঞ্চুর হাতে-পায়ে ধরিয়াছিল; পঞ্চু কিন্তু রাজি হয় নাই। চোখ রাঙাইয়া বলিয়াছিল, "খবরদার! জানাজানি করবি ত' এই ধ্বস্‌-ছাড়া খাদের মুখে ঠেলে' দেব।" ভয়ে সে আর কিছু বলিতে পারে নাই।

তাহার খুঁটে ছিল বারোটি টাকা। তার মধ্যে দশটি টাকা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া ধাই-মাগী পালাইয়াছে; আর জীব্‌নে কোঁড়া সেই যে রাত্রে কখন্‌ চলিয়া গেছে তাহার পর আর ও-পথ মাড়ায় নাই।

সকালে অতিকষ্টে ওই মরা ছেলেটাকে হাতে

লইয়া কোন রকমে সে এইখানে চলিয়া আসে। কোঁড়াদের ছেলেগুলা তখন গরু চরাইতেছিল।

ডাক্তার ডাকিবার জন্য তাহাদের সে একটি টাকা দিয়াছে।

আর-একটি টাকা—

ছবি তাহার খুঁট হইতে খুলিয়া ডাক্তারের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

"যা করতে হয় করুন, বাবু! বাঁচব না তা জানি। তবে এক গ্লাস জল···কাঁচা জল···তা হোক্।"

ডাক্তারবাবু উঠিলেন।

কোঁড়াদের ছেলেগুলা তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। টাকাটা তাহাদের হাতে দিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ডাক্ ত' জীব্‌নেকে!"

ডাঙ্গাল-পাড়া সুমুখে দেখিতে পাওয়া যায়,— বেশি দূরে নয়। কিন্তু ছেলেগুলা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঘরে ত' নাই। উ পালাঁইছে বাবু।"

পালানোই উচিত।



কিন্তু মেয়েটাকে কোথাও একটুখানি ছায়ায় লইয়া যাইতে পারিলে ভাল হয়। ডাক্তারবাবু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কাছাকাছি গাছ কোথাও নাই।

ছবি তখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "থাক্, আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বলিয়া কোঁড়াদের ছেলেগুলাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "আয় আমার সঙ্গে।"

ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চড়িলেন।

ছবি আর একটি প্রশ্নও মুখে আনিল না।

একে একে প্রত্যেকটি প্রাণী তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল।

আসন্ন মৃত্যু—

জনহীন উত্তপ্ত প্রান্তর—

পিপাসার্ত্ত কণ্ঠে দারুণ যন্ত্রণায় ছবি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

ঔষধ লইবার জন্য ভিন্ন গ্রামের রোগী আসিয়াছিল।

অত বেলায় স্নানাহার করিয়া রোগী বিদায় করিতেই বেলা পড়িয়া গেল।

কোঁড়াদের ছেলেদের হাতে ছবির জন্য ডাক্তারবাবু এক গ্লাস গরম দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পরাশরবাবুর দরজায় গিয়া তিনি এত ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু পঞ্চুর সাড়া মিলিল না। ঘরে আছে কি জীবনে কোঁড়ার মত পলায়ন করিয়াছে তাহাও কেহ বলিতে পারিল না।

অগত্যা ডাক্তারবাবুকে আবার একাই সেই মাঠের মাঝখানে ছুটিতে হইল।

গিয়া দেখেন, কোথাও কেহ নাই। মেয়েটা যেখানে পড়িয়াছিল সেখানে মাত্র তাঁহার দুধের গ্লাসটা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে, আর ভিজা

মাটি ও গ্লাসের উপর কালো কালো কতকগুলা পিপ্ড়া আসিয়া জমিয়াছে।

শ্যাওড়া-গাছটার এদিক-ওদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, ঢালু মাঠের নীচে খানিকটা নামিয়া গেলেন, কিন্তু মেয়েটার কোনও চিহ্নই তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন না।

ছেলেগুলা ধরাধরি করিয়া হয়ত তাহাকে ডাঙ্গাল-পাড়ায় তুলিয়া লইয়া গেছে।

কাছেই ডাঙ্গাল-পাড়া। কোঁড়াদের ছোট ছোট বস্তিগুলি সুমুখে দেখা যায়। ডাক্তারবাবু ধীরে-ধীরে সেই দিকে আগাইয়া চলিতেছিলেন, সহসা মনে হইল, পুরানো-খাদের ভাঙা ইঞ্জিন-ঘরটার পাশে কাহারা যেন কথা কহিতেছে।

ফিরিয়া দেখিলেন। সত্যই তাই। স্বচ্ছ দিবালোকে স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা গেল, দু'ধারে দু'জন,—এক-ধারে পঞ্চু, আর-এক ধারে কোঁড়াদের সেই ছেলেটা—ধ্বসিয়া-পড়া খাদের

মুখে মেয়েটাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। কালো চুলের গোছা-সমেত মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে,—বেশি উঁচু করিয়া তুলিতে পারে নাই,—কোমরের কাছটা যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মেয়েটাকে যে খাদের নীচে ফেলিয়া দিবার বন্দোবস্ত চলিতেছে, দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু পঞ্চুকে বিশ্বাস নাই, জীবন্ত অবস্থাতেই তাহার এই সমাধি হইতেছে কি না জানিবার জন্য ডাক্তারবাবু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। হাতের ইসারা করিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, "থাম! থাম্, ওরে থাম্!"

কোঁড়াদের ছেলেটা পা দুইটা ধরিয়াছিল, চীৎকার শুনিয়া সহসা মুখ ফিরাইয়া হাত দুইটা সে ভয়ে ভয়ে ছাড়িয়া দিল। ভারি দেহ পঞ্চু একা ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সেও ছাড়িয়া দিতেই ধপ্ করিয়া ঘাড় দুম্ড়াইয়া মেয়েটা আবার মাটিতে পড়িয়া গেল। হাত দুইটা তেমনি উপরের দিকে তোলাই রহিল।···মরিয়াছে নিশ্চয়ই।

ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া পঞ্চু কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কোঁড়াদের এই ছেলেটার হাতেই তিনি দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র ছেলেটা মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এলম্ যখন, তখন উ হঁয়ে গেইছিল ডাক্তর।"

হইয়া যাইবে তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু এই কি তাহার পরিণাম নাকি? কাপড়টা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া পরাইয়া দিতে পারে নাই। কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গার উপর পায়ে ধরিয়া এমনি করিয়া তাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে, যে, অমন সুন্দর লম্বা কালো চুল ইহারই মধ্যে ধূলায় একাকার হইয়া জট্ পাকাইয়া গেছে, আসন্নপ্রসবা মাতার অনুন্নত সুন্দর শুভ্র দুটি স্তনে তখন দুধ জমিয়া জমিয়া বোঁটা দুইটি কালো হইয়া উঠিতেছিল, সাদা চামড়ার নীচে মোটা মোটা সবুজ শিরাগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়,—কিন্তু প্রাণহীন নিস্পন্দ

সে দেহটার উপরেও অত্যাচার লাঞ্ছনার কোথাও কিছু অবশিষ্ট আছে বলিয়া মনে হয় না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে উপুড় হইয়াই হয়ত সে মরিয়াছিল, তেমনি করিয়াই অতখানা পথ ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতে গিয়া মুখ হইতে বুক পর্য্যন্ত ধারালো পাথরের কুচিতে মৃতদেহটাকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া একাকার করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু তবুও সে তাহার চিরবদ্ধ চোখ দুইটি খুলে নাই। মুখের উপর কেমন যেন একটা নিষ্কৃতির প্রশান্ত ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। জীবনে যাহা বুঝিতে পারে নাই, অভাগী মরণে তাহা বুঝিল কি না কে জানে!

আর দেরি নয়। ডাক্তারবাবু বোধকরি সেই কথাই বলিতে যাইতেছিলেন। পঞ্চুর আর সবুর সহিল না, বলিল, "বাস্, আর দেখতে হয় না, —ধর্!"

দু'জনে আবার তেম্‌নি ধরাধরি করিয়া বার-

কতক দোলা দিয়া মৃতদেহটাকে খাদের 'চানকের' মুখে ছুঁড়িয়া দিল।—গভীর খাতের নীচে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে সেটা তলাইয়া গেল কে জানে। পতনের শব্দটি পর্য্যন্ত কানে আসিয়া পৌঁছিল না।

পঞ্চু এতক্ষণে বোধকরি পরম শান্তি লাভ করিল। স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাস্! কিন্তু ডাক্তার, ভারি অন্যায় তোমার। গাঁয়ে সব জানাজানি হয়ে গেছে।"

ডাক্তার নীরবে শুধু একবার তাহার মুখের পানে তাকাইলেন।

চোখ দুইটা লাল। সম্ভবত মদ খাইয়া আসিয়াছে।

প্রত্যুত্তরে তিনি একটি কথাও বলিলেন না।

কোঁড়াদের ছেলেটা পঞ্চুর কাছে হাত পাতিয়া কি যেন চাহিতেছিল। পঞ্চু বলিল, "আবার? দু'টাকা পেয়েছিস্—"

"সে ত' রত্না, ভগা, টেবো,—ওই ডাক্তরকে শুধোই দেখ নাহয় তুমি—"

"ভাগ্ !" বলিয়া পঞ্চু তাহাকে এক ধমক্ দিতেই ছেলেটা চলিয়া যাইতেছিল ; ডাক্তারবাবু নিজের পকেট হইতে একটি টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "যা,—গোলমাল করিস্‌নে, যা !"

"গোলমাল ? না বাবু···ছোটলোক আমরা, হোই মাঠে···গরু চরাই বাবু···"

আনন্দে অধীর ছেলেটা তাহার কথার খেই হারাইয়া ফেলিল।

ডাক্তারবাবু অন্য পথ ধরিলেন।

"মাইরি আর-কি !" পঞ্চু তাঁহার হাতের মুঠায় একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "পঞ্চু গাঙ্গুলীর দেনাপাওনা হাতে-হাতে বাবা—।" বলিয়া সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

টাকাটি পকেটে ফেলিয়া দিয়া ডাক্তারবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "যাও !"

"যাব আর কোথা ?"—দিনের আলো তখন সবে মাত্র ডুবিয়া আসিতেছে ; পঞ্চু এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "চল···তোমার সঙ্গেই যাই।"

বুঝা গেল, শ্যাওড়াগাছটার তলা দিয়া এখন আর সে একা পার হইতে চায় না।

ডাক্তারবাবু আগে-আগে চলিতেছিলেন, পঞ্চু কেবলই তাঁহার গা ঘেঁসিয়া অনর্গল বকিতে বকিতে পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল।

"......মেয়েটার চেহারা ছিল খাসা,...কি বল ডাক্তার? কিন্তু অম্‌নিই হয়। ও-সব বজ্জাত মেয়ের শেষ-কালটা ঠিক অম্‌নিই...মাঠে-ঘাটেই প্রাণটা হারায়।......তাও ভাগ্যিস্ খবর পেলাম। নইলে আবার পুলিসের হ্যাঙ্গাম-ট্যাঙ্গাম...তার চেয়ে এ বরং..."

পঞ্চু একটুখানি গর্ব্বের হাসি হাসিল।

বলিল, "আচ্ছা, তুমি কেমন করে' টের পেলে বল ত' ডাক্তার? তখন, পেরায় শেষ...কি বল? কথা-টথা কইতে-টইতে পারেনি...কি বল?"

ডাক্তারবাবু অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "আমি একটা রুগী দেখে' এই দিক হয়ে একটু ঘুরে যাব পঞ্চু, তুমি বাড়ী যাও।"

"ছ্যাঃ! কী এমন লাখ টাকার রুগী রাত্তির বেলা দেখতে যাবে?...চল না দাদা আর-একটু... এই ত' এসে গেছি...গল্প করতে করতে...এই আর কতক্ষণ!"

ডাক্তারবাবু চলিলেন।

পঞ্চু আবার বলিতে লাগিল, "তা ছুঁড়ী যদি আমায় আগে জানাতো, তাহ'লে না হয় তোমাকে বলে-কয়ে গোপনে গোপনে...। আর এ ব্যাপারটা কার দ্বারা হয়েছে বুঝতে পারছ?"

বলিয়া সে ডাক্তারের কানের কাছে মুখখানা একটুখানি আগাইয়া আনিয়া বলিল, "আমার ওই ভগ্নিপতিটি ত' আর কম নয়! ওই যে পরাশর...পাৎলা খিট্‌খিটে লোকটি...ওই যে চুপ করে' করে' থাকে, আর মাঝে-মাঝে দু'একদিন আসে...ওরই কম্ম। আমি চিনি যে! আমি ওকে বহুৎ দিন থেকে চিনি।"

হাসিবেন কি কাঁদিবেন ডাক্তারবাবু কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

লোকটা অনর্গল মিথ্যা কথা বলিতেছে, না বেদ পাঠ করিতেছে বুঝিবার জো নাই।

ঘরের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এবার সে আর একটি কথাও বলিল না। ঘরে ঢুকিয়া ডাক্তারের মুখের উপরেই সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

"আলো···আলো কই? দিদি···আলো?"

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পঞ্চু চীৎকার করিতেছিল। লণ্ঠন লইয়া নয়নতারা ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল।···"পঞ্চু! হাঁরে সেই কখন্ বেরিয়েছিলি···!"

পঞ্চু ঘরে ঢুকিলে নয়নতারা বলিল, "হাঁরে, কি যেন শুনছি পঞ্চু, ওর নাম করে' বলছে সব ···ওই-বাবুর বাড়ীর ঝি নাকি কোথায়···"

আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, পঞ্চুর হাসির চোটে আর বলিতে পারিল না।

"দেখ্ দেখি লোকের কেমন কথা! এই ত'

আসছি আমরা সব ! সেই শুনেই গিয়েছিলাম —আমি, ডাক্তারবাবু,—আরও এক গাদা লোক ! কোথা পাবি ! তন্ন তন্ন করে' খুঁজে' দেখে এলাম, কোথাও এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই ।"

"তাই হোক্—!" মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নয়নতারা বলিল, "গুজব তাহ'লে !"

মায়া কিন্তু গুজবটা অবিশ্বাস করিতে পারে নাই।

সে তখন দোতালার ঘরে জানালার উপর বসিয়া বসিয়া বাহিরের অন্ধকারের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাহার কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতে-ছিল, তাহার সেই রূপের কথা। সে রূপ যে নারীর নয়, সে রূপ মায়ের—তাহা সে তখনই সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারে নাই।

যাবার বেলা একটি প্রণাম করিয়া বলিয়া গেল, "আবার ফিরি ত দেখা হবে বৌদি—!"

গোপন করিয়াছিল ভয়ে। ভয় লজ্জা হইবারই কথা। কিন্তু দোষ তাহার একবিন্দু নাই। অপরাধ যে কাহার, তাহা সে জানে।

সহসা পঞ্চুকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অন্ধকারে অদ্ভুত কিছু দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া ওঠে, মায়াও তেমনি হঠাৎ অজান্তে চেঁচাইয়া উঠিল।

পঞ্চুর রাগ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এমনি ভাবে সে তাহার দিকে আগাইয়া গেল, মনে লইল ইহার জন্য তাহাকে সে ভয়ঙ্কর কিছু শাস্তি দিবে—হয়ত বা মারিয়াই বসিবে, কিন্তু মারিল না, শাস্তিও দিল না, প্রবল বেগে মায়াকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া সোহাগ করিয়া সজোরে একটি চুমা খাইল মাত্র।

যখের ধন

তিনকড়ি তাহার যাবতীয় কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

অন্তত নিজে সে তাহাই বলে।

বলে, 'আমি কে?—আমি করি, তিনি করান।'

বলিয়া সেই তিনির উদ্দেশে তিনকড়ি তাহার বড় বড় চোখের তারা দুইটা উল্‌টাইয়া উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকে।

গোপন করিয়াছি ক ছাড়া জল খায় না।
কথা। কিন্তু যে পরিত্যাগ করিয়াছে,—ঘি-দুধ ত'
অপরাধ যে ক উপায় নাই। বলে, 'মাছ-মাংসে
কিছু আছে আমার তা নেই।
সন্‌কনা এই লোভ জিনিষটে ভাল নয়। ওরই
দেখি ন্যি ঝগড়া-ঝাঁটি, ঘর ভাঙাভাঙি—যা-কিছু...'

কিন্তু বৌ তাহার লুকাইয়া লুকাইয়া মাছ কেনে। ধরা পড়িলে বলে, 'সধবা মানুষ, এক-আধদিন না খেলে অমঙ্গল হয়।'

তিনকড়ি বলে, 'তোর গুষ্টির মাথা হয়! জীবহিংসে মহা-পাপ।'

সোনার গহনা বন্ধক রাখিয়া চড়া সুদে টাকা ধার দেয়; সুদবন্ধকী জমিজমার আয় বেশ মোটারকমের; কিন্তু তবুও তাহার হাঁটুর নীচে কাপড় কোনোদিন নামে না। শীতের দিনে কোঁচার খুঁটেই শীত কাটে।

বলে, 'বাবুয়ানি করেই ডুবলো বাছাধনরা সব।'

ঘরে একপাল হাঁস পুষিয়াছে।

গাঁয়ের লোক ফাঁপাইয়া দেয়। বলে, 'চাটুজ্যে মশাইএর হাঁসের পালটি বেশ বেড়েছে যা-হোক্ !······বাড়বে না কেন বাপু, যত্ন কেমন !'

তিনকড়ি বলে, 'কোথা পাবে ? খায় যেমন, তেমন দেয় না। ডিম বিক্রি মোটে সাড়ে সাত টাকার ! কিন্তু নিজে আমি কোনোদিন হাত দিয়েও ছুঁই না ও-সব।'

কথাটা সত্য। হিসাব রাখে কিন্তু স্পর্শ করে না।

পুত্র নাই, একটি মাত্র কন্যা। স্ত্রীই ওই-সব করে। দুটি বোন আছে, কিন্তু বোন দুটিকে বিশ্বাস হয় না।

ত্রিনয়না আর ত্রিগুণা—দুটি বোন।

কিন্তু ডাকিবার সময় আর জিব উল্‌টাইতে হয় না।—তেনানী আর তিগুণী বলিলেই চলে। তেনানীর বিবাহ হইয়াছে।

সে এক ভারি মজার বিবাহ।

আষাঢ়ের প্রথমেই সে-বছর বাদল নামিয়াছিল। চারিদিকে ধানের মাঠ, মাঝখানে ছোট্ট একখানি গ্রাম।

সারা রাত ধরিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরিয়াছে। পরদিন সকালে বাদল তখনও ধরে নাই, এমন সময় সমস্ত গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, গত রাত্রি দ্বিপ্রহরের লগ্নে তিনকড়ির বোন তেনানীর হঠাৎ বিবাহ হইয়া গেছে।

ঢাক নাই, ঢোল নাই, একটা সানাই বাজিল না, অনুষ্ঠান আয়োজন কোথাও কিছুই নাই—বিবাহের মত ব্যাপার অকস্মাৎ গোপনে সম্পন্ন হইয়া গেল।

কৌতূহলী নরনারী বর দেখিবার জন্য বিনা আহ্বানেই জলে ভিজিয়া তিনকড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বর কেহই দেখিতে পায় নাই, অতি-প্রত্যূষেই কুশণ্ডিকা সারিয়া

দিয়া বর তখন কি-একটা বিশেষ প্রয়োজনে চম্পট দিয়াছে।

তিনকড়িকে সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল।

কিন্তু ভগবানই যাহাকে সব কাজ করান, যে শুধু হেতু হইয়া করে মাত্র, তাহার সম্বন্ধে আর কথা চলে না।

তিনকড়ি দিব্যি সহজ গলায় বলিতে লাগিল, 'কি করব দাদা, যে-রকম বাদল তাতে লোকজন ত'...তবে ভরসা এই যে মালিক তিনিই, আমি আর কে ?'

তা বটে।

তিনকড়ি বলিল, 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। কার বাবার সাধ্যি টলায় !'

কিন্তু কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িতে দেরি হইল না।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—

বালিজুড়ি গ্রামটা সেখান হইতে ক্রোশ দুই তিন দূরে। পশুপতি মুখুজ্যের হঠাৎ একজোড়া

চাষের বলদের প্রয়োজন হয়, তাই সে সন্ধান লইয়া এ গ্রামে আসে বলদ কিনিতে,—বিবাহ করিবার জন্য নয়। মুসলমান পাইকারদের কাছে এক জোড়া বলদের দর-দস্তুর সবই স্থির হইয়া যায়, কিন্তু পঞ্চাশটি টাকা তাহার কম পড়ে,—মুখুজ্যের বলদ কেনা আর হয় না। টাকা আনিবার জন্য বাড়ী ফিরিতেছিল, হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। —যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি! বাড়ী ফেরা আর হইল না, রাত্রির মত বন্ধু তিনকড়ির বাড়ী আশ্রয় লইল।

বাস্! সেই আশ্রয় লইতে গিয়াই এত বড় এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

এই ত গুজব।

কিন্তু আসল কথাটা বোধ করি আরও একটু ঘোরালো।

কিছুদিন আগে বিনা প্রয়োজনেই তিনকড়ি ঘন ঘন বালিজুড়ি যাওয়া-আসা করিত।

যাই হোক ব্যাপারটা ভাল হয় নাই। ঠিকা

চুক্তিতে বিবাহ করিয়া বেড়ানোই পশুপতির পেশা এবং এই পেশাদার লোকটার হাতে তেনানীর মত সুন্দরী মেয়েটিকে চিরদিনের মত সমর্পণ করিবার মত দুরবস্থা তিনকড়ির নয়।

শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গের ষাঁড়গুলাকে যেমন করিয়া তপ্ত ত্রিশূলের ছেঁকা মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তেনানীকেও তেমনি কপালে সিঁদুর দাগিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মাছ মাংস খাইতে পায়, সধবা নাম,—এই পর্য্যন্ত।

কুমারী ঘুচিয়াছে,—যৌবনও বুঝি-বা যায়!

কিন্তু পশুপতির মত স্বামী, অগ্রিম টাকা হাতে না পাইলে আসে না। সেই যে বিবাহ করিয়া গিয়াছে তাহার পর আর দেখা নাই।

টাকা খরচ করিয়া তিনকড়ি তাহাকে কোনো-দিন আনিবে না, জানা কথা। তেনানী নিজেই টাকার জোগাড় করে।

তিগুণীকে বলে, 'আয় ভাই, দু'বোনে রোজগার করি।'

ভাই-ঝি বাসনাও তাহাদের সঙ্গ ছাড়ে না।

তেনানী দুম্ দুম্ করিয়া ঢেঁকির মাথায় পাহার দেয়,—তিগুণী হেঁটমুখে তখন গড়ের মুখে হাত বুলাইতে থাকে। সারাদিন ধরিয়া ধানভানা তাহাদের আর শেষ হয় না।

ধান ভানিয়া রোজগার করে। গতর খাটায়।

ইহার-উহার বাড়ী কাজে-কর্ম্মে দু'বোনে কোমর বাঁধিয়া ভাত রাঁধিতে যায়, মুড়ি ভাজে, কলাই ভাজে, লোকের বাড়ী-বাড়ী জল আনিয়া দেয়, দুষ্টু গাইএর দুধ দোয়,—দু'চার আনা যা পায়!

তিনকড়ির স্ত্রী—বিন্দু-বৌ, আভাষে-ইঙ্গিতে দু'কথা শুনাইতে ছাড়ে না। খিড়্কির পুকুরে জল আনিতে গিয়া হ্যাক্ করিয়া খানিকটা থুতু ফেলিয়া বলে, 'ভাইএর ঘরে অন্ন ধ্বংস, আর

নিজের সাথক্ ষোলআনা। পরের ধান ভেনে' ভেনে' ঢেঁকিটা আমার গেল······'

তেনানী শুনিতে পায়, কিন্তু কিছু বলে না, চুপ করিয়া থাকে।

দু'আনা হইতে চার আনা হয়, চার আনা হইতে আট আনা, আট আনা হইতে টাকা, টাকা হইতে নোট। টাকা আবার সুদে খাটে। সুদের টাকায় ছাগল কেনে, বাছুর কিনিয়া দাম্ড়া করে, আবার দাম্ড়া কিনিয়া বলদ বেচে।

টাকা পয়সাগুলা যেন হাত পা বাহির করিয়া চলিতে থাকে।

কিন্তু অত বাড়াবাড়ি বিন্থ-বৌএর সহ্য হয় না।

সেদিন তেনানী, তিগুণী, বাসনা, তিনজনেই দূরের পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল।

খিড়্‌কির পুকুর হইতে হাঁসগুলাকে তাড়াইয়া আনিয়া বিন্থ-বৌ আপনমনেই বকিতে বকিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তিনকড়ি তখন চালায়

বসিয়া একাগ্রমনে হেঁটমুখে একটা ছেঁড়া কাপড় বিশেষ দক্ষতার সহিত সেলাই করিতেছিল।

বিজু-বৌ তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, 'না, অত ভালবাসা ভাল নয়! গয়না কাপড় দিয়ে ভালবাসতে পারিস্ ত' জানি যে, হ্যাঁ ভাল-বাসা! তা না, নাকে-দমে খাটিয়ে খাটিয়ে মেয়েকে আমার বাড়তে দিলে না!'

ছেলেপুলে বলিতে মাত্র হ্যাংলাপানা ওই মেয়েটি সম্বল। খাটাইলে রাগ হইবারই কথা। কিন্তু বাড়িতে না দেওয়ার অপবাদটা অমূলক। বাসনার বয়স প্রায় তেরোর কাছাকাছি,—বাড়-বাড়ন্ত যথেষ্ট। এমন কি, বিবাহ তাহার আজ দিলেও হয়, কাল দিলেও হয়। তবে চেহারা ভাল নয়—এই যা!

কিন্তু তাহার চেয়ে দেখিতেও ভাল, বয়সেও বড়,—তিগুণীর এখনও বিবাহ হয় নাই।

কথাগুলা তিনকড়ি শুনিতে পাইল না ভাবিয়া বৌ এবার আর-একটুখানি চড়া-গলায় সুরু

করিল,—'তোরা খাট্‌চিস্, রোজগার করচিস্, আপনার সাথক হচ্ছে, তাতে আমার কি?······ বাসনাকে ঢেঁকিতে পা'র দেওয়ানো কেন বাপু? পা'র দেওয়ার ও জানে কি? আজ-বাদ কাল বিয়ে দেব······মুখ থুব্‌ড়ে পড়েই যদি গেল? পিসিরা কচি খুকি; কিছু যেন জানেন না!'

তিনকড়ি এইবার মুখ তুলিল। সোহাগ করিয়া বলিল, 'কি বলছ কি গো, বিধুমুখী?'

বৌ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ব'লে আর হবে কি? হাজার হোক্, বোন ত!······ বলি, বোন যে বড়লোক হলো! লুকিয়ে লুকিয়ে পয়সা যোগাচ্ছে, আর তুমি শুধু ভাত-কাপড় জোগাবার মালিক!'

তিনকড়ি তাহার বড় বড় দাঁত কয়টি বাহির করিয়া হাসিল। বলিল, 'তুই চুপ কর্ মাগী, তুই চুপ কর্! ভগবান্ মালিক! জোগাচ্ছে—জোগাক্ না! আমাকেই দিয়ে যাবে শেষে,—দেখে নিস্!'

বিধুমুখী হাত নাড়িয়া বলিল,—'হাঁ, দেবে তোমাকে খাইয়ে! তিগুণীর বিয়ে দাও, ছেলে-পুলে একটা হোক্, তারপর দেখ্‌ব কাকে দেয়।'

তিনকড়ি বলিল, 'অনেক দেখলাম। ভ্যাখ্ বাবা জমালে টাকা, দিয়ে গেল মাকে, আবার মা দিয়ে গেল আমাকে; তেনানী জমাচ্ছে,—দিয়ে যাবে তিগুণীকে, আবার তিগুণী দিয়ে যাবে আমাকে। এই হয়ে আসছে, হবেও চিরকাল। ভগবান মালিক বিধুমুখী, ভগবান মালিক।'

বলিয়া সে আবার সেলাই করিতে লাগিল।

বিদু-বৌ বলিল,—'তাই দেখা যাবে।'

তেনানীর সমবয়সী বন্ধুদের ছেলেমেয়ে হইয়াছে। স্বামী আসে,—কেহ-বা জুতা পরিয়া;—কেহ-বা টেরি কাটিয়া। কেহ-বা চাকরি করে,—কেহ-বা বেকার।

বন্ধুরা সেদিন ভাল ভাল শাড়ী পরে, সেমিজ

পরে, চুল বাঁধে; আলতা কামায়, পান খায় আর হাসে।

তেনানীর ইচ্ছা করে, তাহাদের সঙ্গে একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করিয়া আসে, ছেলে-মেয়েকে কোলে লইয়া আদর করিয়া চুমা খায়।

কিন্তু কাজের ভিড়ে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না।

সেদিন হরিমতির স্বামী আসিয়াছিল। লোকটি বেশ ভাল লোক।

তেনানী তাহার কাছে গিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, 'কই একখানি চিঠি লিখে দাও দেখি ভাই, দেখি কেমন লেখাপড়া শিখেছ!'

জামাইটির নাম গিরীশ। কোথায় কোন্ বিদেশী যাত্রার দলে বক্তৃতা করিয়া সংসার চালায়। বলিল, 'লিপি? কার কাছে লিপি তব প্রেরিবে সুন্দরী? কে সে ভাগ্যবান মহা-পুরুষ প্রবর?"

হরিমতি ঘোম্‌টা টানিয়া দরজার কাছে

দাঁড়াইয়াছিল। তেনানী বলিল, 'গ্যাখ্‌লো গ্যাখ্‌, ঢং গ্যাখ্‌ বুড়ো মিন্‌ষের!......না ভাই, সত্যি বলছি, দাও না......দাও না ভাই লিখে!'

গিরীশ বলিল, 'বাঃ! কার কাছে লিখবো বলবে না?'

তেনানী তাহার লজ্জাটিকে গোপন করিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল। বলিল, 'কেন, নাই নাকি আমার কেউ চিঠি লিখবার?'

হরিমতি তাহার ঘোম্‌টা তুলিয়া চোখ টিপিয়া গিরীশকে কি যেন ইঙ্গিত করিল।

হরিমতির লিখিবার সরঞ্জাম ঘরেই ছিল। গিরীশ তৎক্ষণাৎ লিখিতে বসিল। 'বল এবার কি লিখিতে হবে, বল!'

'জানি নাকো।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে তেনানী দরজার কাছে আসিয়া হরিমতিকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'লিখতে

জানেন না, হাতে ধরে লিখিয়ে দিগে ত' ভাই!'

তের-চোদ্দ বছরের একটি ছেলেকে বাবা-বাছা করিয়া তু'আনা পয়সা দিয়া অনেক কষ্টে অনেক সন্তর্পণে চিঠিখানি দিয়া তেনানী বালিজুড়ি পাঠাইয়াছিল।

ছেলেটা সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল।

পশুপতি বলিয়া পাঠাইয়াছে, 'চিঠিতে আমরা যাই না। টাকা চাই। টাকা পাঠাতে বল্‌গে যা।'

কিছুদিন পরে সেই ছেলেটিকে দিয়াই তেনানী পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

টাকা পাঁচটি পশুপতি লইয়াছে, বলিয়াছে 'পাঁচ টাকায় হয় না, দশ টাকা পাঠাতে বলিস্।'

আবার পাঁচ!

অত কষ্টের টাকা······কিন্তু কিসের জন্য?

তেনানী আবার পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

টাকা সে এবারেও লইয়াছে, বলিয়াছে 'কাল যাব।'

পরদিন সকাল হইতে কোনও কাজেই তেনানীর আর মন বসিতেছিল না। বৈকালে জল আনিতে গিয়া লুকাইয়া সে সাবান মাখিয়া আসিল, ফর্সা শাড়ী পরিল। তিগুণী ও বাসনা হয় ত এখনই কিছু বলিয়া বসিবে ভাবিয়া দু'জনকে দুইটি পয়সা দিয়া দোকানে পাঠাইয়া দিল। বাসনাকে বলিল, 'যাও ত' মা দুজনে, দোকান থেকে পান, এলাচ আর লবঙ্গ নিয়ে এসো ত মা!'

সেই অবসরে তাড়াতাড়ি চুলগুলা খুলিয়া সে মাথা বাঁধিতে বসিল।

কিন্তু হায়, এত আয়োজন তাহার বৃথা হইল। পশুপতি আসিল না। রাতটা যে তাহার

কেমন করিয়া কাটিল, বলিলেও সে দুঃখের কাহিনী কেহ বুঝিবে না।

অনেকদিন পর্য্যন্ত তেনানী তাহার আশা ছাড়িতে পারিল না।

এই আসে! এই বুঝি আসে!

কিন্তু মাসের পর মাস চলিয়া গেল—

পশুপতি আসিল না।

অথচ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিবার নয়।

কিছুদিন পরে তেনানী আবার সেই ছেলেটার কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল।

'যাও ভাইটি,...আর-একবার যাও ভাইটি...'

'এবার কিন্তু আমি তিন আনা পয়সার কম ছাড়ব না, তা বল্লে দিচ্ছি, হেঁ!'

'তাই দেব।' বলিয়া তেনানী তাহাকে আবার সেখানে যাইতে রাজী করিয়া আসিল।

এবার দশ টাকা—!

টাকা দশটি ছেলেটির কাপড়ের খুঁটে বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া তেনানী তাহাকে অনেক কথাই শিখাইয়া দিল। বলিল, 'বলিস্ যেন—এই শেষ। এবার না এলে টাকাকড়ি কিচ্ছু পাবে না।'

ঘাড় নাড়িয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'বল্লে, পরশু যাব সন্দ্যেবেলা।'

'আর কি বললে রে?—শোন্—শোন্!'

ছেলেটা আর দাঁড়াইল না। বলিল, 'আমার বুঝি ক্ষিদে পায়নি?'

কিন্তু এবারও তাই!

কত পরশু পার হইয়া গেল,—পশুপতি আসিল না।

রাগে দুঃখে অভিমানে তেনানী তাহার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

ইহার বেশি আর কিই-বা সে করিতে পারে!

তিনকড়ির সঙ্গে কথা কহিতে ভয় করে। সব সময় তাহার মাথার ঠিক থাকে না। ঘরের লোক তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে ভাবে বুঝি কিছু চাহিতে আসিয়াছে,—অম্‌নি সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তেরিয়া-মেরিয়া করিয়া ওঠে।

তবু সেদিন অতি-দুঃখে তেনানী তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল, 'তিগুণীকে আর আমার মত করে' দিও না দাদা! তার চেয়ে গাঁয়ে একটি ছেলে আছে,—ওপাড়ার সেই ভোলানাথ, ওকেই দাও!'

তিনকড়ি চোখ দুইটা তুলিয়া বলিল, 'কে? ভোলানাথ?—ও! সেই শ্রীহর্ষর ব্যাটা! কিন্তু শ্রীহর্ষ মারা যাবার পর অবস্থা ত' তেমন......'

তেনানী বলিল, 'তা হোক্ দাদা, তুমি একবার যাও! ভোলানাথ কোথা চাক্‌রি করে, আজই এসেছে দেখলাম। তবু গাঁয়ে-ঘরে থাকবে,—দেখতে পাব, বলতে পাব......'

তেনানী আর-কিছু বলিতে পারিল না।

পরদিন বৈকালে ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনকড়ি ঘরে আসিয়া বলিল, 'না তেনানী, হলো না। ছেলেটি দেখলাম। ছেলেটি ত মন্দ নয়। মা বোনকে কিচ্ছু দেয় না। তা না দিক্। চাকরি করে,—হাতে কিছু কিছু জোগায় হয়ত।···বিয়ে দিতে হলে তিনশ টাকা চায়—নগদ। তাও না হয় দেড়শ'তে নামিয়েছি। গয়নাও যা চায় তাই না হয় দিলাম! কিন্তু—বছরে তিন মাপ করে' চাল চায়। বলে, বোন তোমার খাবে কি?··· ·· ওইখানেই গোলমাল তেনানী!'

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু! চাল আমি দিতে পারব না।'

তেনানী বলিয়া উঠিল, 'তা হোক্ দাদা, চাল না হয় দুখ্-ভিখ্ করে আমি নিজেই দেব।'

তুমি ওইখানেই ঠিক কর।'

খানিক্ ভাবিয়া তিনকড়ি বলিল, 'তবে······ তা বেশ! কিন্তু আর-একটি ছেলের সন্ধান দেখি তা'হলে! বাসনারও যাতে ওই একসঙ্গেই ······দুনো খরচ আমি করতে পারব না বাপু! হাঁসগুলো সব এলো? কই গো! কোথা রয়েছ তুমি?'

বিহু-বৌ দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সবই শুনিতেছিল। বলিল, 'হ্যাঁ এসেছে। শোনো তুমি!'

তিনকড়িকে কোঠাঘরের উপরে লইয়া গিয়া বিহু-বৌ যেন একেবারে মার-মূর্ত্তি হইয়া বলিয়া উঠিল, 'বছরে তিন মাপ করে' চাল আর দিতে পারবে না তুমি? এই নাও—'

বলিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ-হাতের সোনার বালাটা খুলিতে খুলিতে বলিল, 'এই নাও আমি দিচ্ছি। ও মা গো! সব্বনাশীর কথা দ্যাখো দেখি! বলে কিনা, ভোলানাথের সঙ্গে তিগুনীর বিয়ে! আর—আমি আজ পাঁচ বচ্ছর

ধরে' ভেবে রাখলাম ওকে আমার বাসনার সঙ্গে বিয়ে দেব! বলি একটি মাত্র মেয়ে আমার, চোখে-চোখে রাখব চিরদিন,—আর তুমি কিনা··· বোনের স্বগগবাস, আর দুটো নয় চারটে নয়, একটা মেয়ে,—তারই গলায় ফাঁসি! যা খুশী তাই কর, তোমার যা খুশী·····'

বলিতে বলিতে বিদু-বৌ ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কথাগুলা তিনকড়ির হাড়ে হাড়ে ভিজিল বোধ হয়।

বৌএর হাতখানা ধরিয়া বলিল, 'কেঁদো না, চুপ কর!'

বলিয়া পরম বিজ্ঞের মত চোখ বুজিয়া তিনকড়ি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'কিন্তু গোলমালটি করেছ কি, মরেছ তুমি! চুপটি করে' বসে থাকো! বাস্! ভগবান আছেন মাথার ওপরে, কিচ্ছু ভাবনা নেই!'

এই বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তিনকড়ি

উঠিতে যাইতেছিল, বিন্থ-বৌ টপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিল, 'উঠছো কোথা, বসো! বলে যাও আমার কাছে—'

তিনকড়ি পুনরায় বসিল।

তিনকড়ি খাইতে বসিয়াছে।

তেনানী ভাত দিয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল, 'দেখলি তেনানী,—মেঘ চাইতেই জল! বাসনার মামার এক চিঠি এসে হাজির! বর একটি ঠিক করেছে, বাসনার ঠিক উপযুক্তই হবে, লেখাপড়া করে, বেশ বুদ্ধিমান। ···একদিনেই দিন করে' ফেলি···না কি বল্? আবার দুনো খরচ কেন?···ভগবান আছেন রে, নারায়ণ আছেন! ভগবান যার সহায়,—অরণ্যেও চারটি অন্ন তার মেলে। নারায়ণ! নারায়ণ!'

বলিয়া সে তাহার অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

আনন্দে তেনানীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

কয়েকদিন ধরিয়া তিনকড়ির অবসর মোটেই ছিল না।

ভোলানাথের সঙ্গে তিগুণীর বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গেছে।

তেনানীর আনন্দের আর সীমা নাই। যার-তার কাছে যেখানে-সেখানে বলিয়া বেড়ায়,—নিজের কিছু হইল না, এইবার বোনের যদি কিছু হয়!

ভোলানাথ দিনে দিনে তাহার কাছে অপরূপ সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছে। অমন ছেলে,—জামাই করিবার মত অমন উপযুক্ত পাত্র পৃথিবীতে বোধ হয় খুব কমই আছে। কম কেন, নাই বলিলেই হয়। পথ দিয়া পার হইয়া যায় ত' মনে হয় যেন রাজপুত্র হাঁটিতেছে। যেমন নাক, তেমনি চোখ,—তেমনি গায়ের রং।

তিগুণী ও বাসনার একসঙ্গে, একরাত্রে, একই লগ্নে বিবাহ।

তিগুণীর বর ত গ্রামেই,—বাসনার বর আসিবে তাহার মামার বাড়ী হইতে।

লগ্ন উপস্থিত।

বরের সাজ-পোষাক পরিয়া পাল্কি চড়িয়া ভোলানাথ আসিল, কিন্তু মামার বাড়ীর বর তখনও আসে না।

লোকজন সব এদিক-ওদিক চাওয়া-চাওয়ি করে, লগ্ন বুঝি-বা ভ্রষ্ট হইয়া যায়......

তেনানী বলিল, 'দাদা, লোক পাঠাও!'

তিনকড়ি মহা শশব্যস্ত হইয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল, কথা কহিবার অবসর নাই, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'লোকজন আর এসময় পাই কোথা বোন্?...দেখ্ ত' দেখ্ ত' —তোরাই জনকতক মেয়েছেলে......যা ত' কোন একটা লণ্ঠন নিয়ে......পদ্মপুকুরের পাড়ে গিয়ে

দাঁড়াগে যা ! যা, যা, দৌড়ে যা !······ও হরিমতি ও আনি, ও ভানী ! যা ত' মা ! তেনানীর সঙ্গে যা ত' মা তোরা ! নারায়ণ ! নারায়ণ !'

বলিবামাত্র হুজুগ পাইয়া মেয়েগুলা লণ্ঠন লইয়া বর দেখিতে ছুটিল।

* * * *

বালিজুড়ি হইতে পশুপতি আসিয়াছে। তিনকড়ি সেদিন নিজে তাহাকে আনিতে গিয়াছিল।

ভোলানাথের সঙ্গে বরযাত্রী বেশি কেহ আসে নাই। জানে ও চামারের বাড়ী গিয়া কোনও লাভ নাই।

তিনকড়ির দিকে পশুপতি তাহার টেরা-চোখের দৃষ্টি হানিয়া বলিয়া উঠিল, 'লগ্ন যে যায় হে!'

লগ্ন ভ্রষ্ট হইলেই সর্ব্বনাশ! দেবতার নামে যে পশু একবার উৎসর্গীকৃত হইয়া গেছে, কোপ না বসাইলে তাহারও নাকি খুঁৎ রহিয়া যায়।

তিনকড়ি তাহার নামাবলীর সন্ধানে ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল; পশুপতি তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দেরি কিসের?—দাও এবার!' বলিয়া হাত পাতিল।

তিনকড়ি বলিল, 'আঃ! থামোই না হে! হয়ে যাক্ না কাজটা আগে,—চুকেই যাক্।'

কিন্তু পশুপতি অবুঝ নয়। তিনকড়িকে সে চেনে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, হলো না তা'হলে!'

বিন্থ-বৌ কোনোদিন পশুপতির স্থমুখে বাহির হয় না। কিন্তু আজ সে অন্ধকার ঘরের কোণে কোথাও লুকাইয়া ছিল, না, উপর হইতে হুট্ করিয়া নামিয়া আসিল কে জানে! এবং শুধু নামিয়া আসিয়াই ক্ষান্ত হইল না, পশুপতির প্রসারিত হস্তে তুইটি নোট ও কয়েকটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া ঘোম্টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পশুপতি গুণিয়া দেখিল। কিন্তু পাঁচ টাকা

কম। আবার হাত পাতিল। বলিল, 'আরও পাঁচ টাকা?'

তিনকড়ি তখন তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিবার জন্য পশ্চাৎ দিক হইতে ক্রমাগত ঠেলা দিতেছে।

'আর নেয় না, হুঁঃ! আর নেয় না। চল—চল—!'

পশুপতি আবার ঘাড় নাড়িল।—'আমাদের ভাই যে-কথা সেই কাজ!······নাও বৌ তোমার টাকা-পঁচিশটি ফিরে নাও,—হলো না।'

বিন্দু-বৌএর রাগে তখন প্রায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিবার অবস্থা।

লজ্জা শরম আর রহিল না, ফস্ করিয়া ঘোম্‌টা তুলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনকড়ির দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ওই চণ্ডাল আমায় পঁচিশ টাকা বলেছিল।··· যাও ঠাকুর-জামাই, যাও তুমি! আমি দেব টাকা।'

তিনকড়ি বলিল, 'টাকা তুই বিয়োবি?'

কথাটা কিন্তু পশুপতি শুনিতে পাইল না। বিহু-বৌএর দিকে সকরুণ লুব্ধদৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া সে বাহির হইয়া গেল; জীব-ধাত্রী শ্যামা-মায়ের প্রসাদী পুষ্প লইয়া হন্তারক যেমন করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া যায়।

উপরে মেয়েছুটাকে রাখিয়া আসিয়াছে। বিহু-বৌকে আবার উঠিয়া যাইতে হইল।—তা হোক্। ঘুল্‌ঘুলির ফাঁকে উঠান পর্য্যন্ত নজর চলে।

দেখিল, মেয়েছুটাকে ঠিক যেমনটি বসাইয়া রাখিয়া গেছে, ছোট সেই জানালাটির ধারে বাসনা ও ত্রিগুণী ঠিক তেমনি করিয়া হলুদ-রঙের শাড়ী দুইটি পরিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

......পদ্মপুকুরের পথের পাশে নতুন বরের পাল্কি-বেহারার শব্দ আসিবে।......হয়ত বা হঠাৎ ওই গ্রামান্তরালের আঁধার-পথে মশাল জ্বালিয়া

দেখা দিবে, কিম্বা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া চৌদলে বসিয়া আসিতেছে,—তাই বা কে জানে!

ভানী ছেলেমানুষ। রাত্রিকালে পদ্মপুকুরের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার ভয় করিতেছিল। বলিল, 'না দিদি না, বর আসবে না। চল্—বাড়ী ফিরে চল্।'

কিন্তু তাহার কথা তখন কে-ই বা শোনে!

তেনানী বলিল, 'উ-ই দ্যাখ্!'

ফাঁকা মাঠের ওপারে দূরে কয়েকটা গাছের পাশে একটা আলো দেখা যাইতেছিল।

কিন্তু কিসের আলো কে জানে! তেনানী একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। আলোটা ক্রমশ একটু একটু করিয়া কোথায় কোন্ গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। এদিক দিয়া আর আসিল না।

তেনানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। পথের ধারে সে বসিয়া পড়িল। হরিমতি বসিল, আনিও বসিল, ভানীও বসিল।

কোথায় কোন্ মাতাল-শালে মদ খাইয়া কয়েকজন মজুর মাঠের পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহাদের গোলমালে আচম্‌কা মুখ ফিরাইয়া তেনানী বলিল, 'কে রে! কোন্ গাঁয়ের তোরা ?'

কে একটা বুড়া-লোক বলিয়া উঠিল, 'না মা, চোর নই মা!'

আর-একজন বলিল, 'জোস্তা রাতে চোর কোথা পাবে মা ? আঁদার রাতে চোর থাকে।'

আনি, ভানী, দুজনেই ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হরিমতি বলিল, 'হাসিস্ না লো হাসিস্ না তোরা! এদিকে বলে যা হবার তাই হচ্ছে, আর হাসি ত্যাখো!'

তেনানী বলিল, 'ওরে ও······ও মাতালরা! শুনচিস্? আমাদের বর আসবে বাপু, পথে যদি দেখা হয় ত বেহারাদের একটু পা চালিয়ে আসতে বলিস্!'

'বেশ মা বেশ, বলে' দেব। দেখা হলেই বলে' দেব।'

কথাটা বোধ করি নেশার ঝোঁকে প্রত্যেকেই একবার করিয়া বলিয়া গেল।

কিন্তু কোথায় বা বর আর কোথায় বা পাল্কি!

নিস্তব্ধ গ্রামের প্রান্তে মানুষের সাড়াশব্দ কোথাও নাই। প্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গেছে। শেয়ালগুলা একবার করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।—দূরের গ্রাম হইতে কয়েকটা কুকুরের ডাক শোনা যায়।

পদ্মপুকুরের জলের ধারে চিড়্‌চিড়ি গাছের ঝোপের ভিতর কয়েকটা ডাহুক্ পাখী বাসা বাঁধিয়াছিল; অন্ধকারে অসময়ে মানুষ দেখিয়া ডাহুকীর বাচ্ছাগুলা বোধ করি ভয় পাইয়া এতক্ষণ পরে চেঁচাইতে লাগিল।

এমন করিয়া আর কতক্ষণই বা বসিয়া থাকে!

হরিমতি বলিল, 'মাঃ! কোমর-কাঁকাল ধরে' গেল!'

তেনানী উঠিল। বলিল, 'চল্!'

কিন্তু এ নিদারুণ দুঃসংবাদ দাদা তিনকড়ি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে কে জানে!

আনি বলিল, 'আচ্ছা, বাসনার কি হবে ভাই তা হ'লে?'

তেনানী কথা কহিল না।

বাড়ী ফিরিয়া তেনানী যাহা দেখিল, তাহার চেয়ে মাথার উপর আকাশের বজ্র ভাঙিয়া পড়িলেও বুঝি-বা ভাল হইত।

বিবাহ তখন প্রায় শেষ।

পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বাসনার হাতের উপর ভোলানাথের হাত—

আর তিগুণীর?

তেনানী সে দৃশ্য চোখে আর দেখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

তিগুণীকে বিবাহ করিতেছে পশুপতি।
—তাহার স্বামী!

পাগলের মত বিভ্রান্ত অবস্থায় তেনানী খিড়্‌কির পুকুরের দিকে ছুটিতেছিল. সেখানে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া আসিল।

রান্নাঘরের পাশে যে-ঘরটায় তাহারা থাকে, তাহারই দরজায় গিয়া সে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। মুখ দিয়া কথা সরে না, চোখ্‌ দিয়া দর্‌ দর্‌ করিয়া জল গড়াইয়া আসে। কি করিবে সে—কি করিবে? মরিবে? জলে ডুবিবে? বিষ খাইবে?......তেনানী সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া ধূলায়-মাটিতে ঠিক যেন কাটা-ছাগলের মতই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। হরিমতি ধরিয়া তুলিতে গেল, সজোরে তাহাকে এক ঝাঁকানি দিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তেনানী উঠিয়া বসিল, এবং বসিয়াই দরজার চৌকাঠের উপর মাথাটা তাহার ঠাই ঠাই করিয়া ঠুকিতে আরম্ভ করিল।

মার খাইয়াও হরিমতি ছাড়িল না ; মেয়েগুলা সকলে মিলিয়া জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু কিছুতেই সে মানা মানে না ; একেবারে যেন পাগল হইয়া গেছে।

এদিকে বিবাহ শেষ করিয়া তিনকড়ি আসিল। পুরোহিত আসিলেন। মজা দেখিবার জন্য আরও কয়েকজন আসিতে চাহিতেছিল, কিন্তু দুলোর-মা হেঁসেল হইতে বাহির হইয়া লোহার খুন্তি হাতে লইয়া তাহাদের খেদাইয়া দিল। 'ওদের দুখ্‌ হয়েছে, আহা, তোরা কি জন্যে যাবি বাছা মজা দেখতে ?'

বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁহার হাতের লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিতেই তেনানীর বুকের আঁচলটা হরিমতি তুলিয়া দিল। দেখা গেল, কপালটা কাটিয়া রক্তের ধারা চোখের কোণ বাহিয়া গালে আসিয়া জমিয়াছে।

পুরোহিত বলিলেন, 'ছি ছি মা, করেছিস্‌ কি ! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—ও কি আর কারও খণ্ডাবার জো আছে মা !'

তিনকড়ি বলিল, 'পুরুষ মানুষ তাই চুপ করে' আছি কোনো রকমে, নইলে কি আর হায় হায়......' বলিয়া সে তাহার নামাবলীর খুঁট্‌টা তুলিয়া দুই চোখের উপর চাপিয়া ধরিল।

তেনানীর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটিল। পাগলের মত চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, 'দাদা......' কিন্তু বাকি কথাটা সে আর বলিতে পারিল না। ঠোঁট দুইটি অসম্ভব রকম কাঁপিয়া উঠিল, চোখের অশ্রু গালের রক্তের ধারাটিকে ধুইয়া আনিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কাপিড়ের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু দুঃখ—তা সে যত বড়ই হোক্‌, একমাত্র মানুষই তাহা বর্‌দাস্ত করিতে পারে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, যেমন চলিতেছিল আবার তেমনি সবই চলিতেছে। বন্ধকী টাকার সুদ দু'পয়সা করিয়া হইলে তেইশ টাকার সুদ

যে মাসে সাড়ে-এগারো-আনা হয়, গয়লা-বৌকে তেনানী সে-কথা কিছুতেই বুঝাইতে পারে না।

তিগুণী হাসিতে হাসিতে বলে, 'তা হোক্ দিদি, এগারো আনাই হলো, দু'পয়সা না হয় ছেড়েই দে!'

বাসনাও হাসিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'পিসির খালি টাকা আর টাকা, ছেলে আর ছেলে!'

ছেলের কথাটা শুনিয়া পিসিও হাসে, ভাই-ঝিও হাসে।

বাসনার বুকে হাত দিয়া কাপড়ের তলায় কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে তেনানী বলে, 'রেখেছিস্ ত মাদুলিটি?'

মাদুলিটি বাবা খগেশ্বরের। যে-সব মেয়ের ছেলে হয় না, যাহাদের স্বামী আসে না, রবিবার দিন বাবা খগেশ্বরের মন্দিরে গিয়া পূজারীকে দশটি পয়সা দিয়া এই কবচটি তাহারা ধারণ করিয়া আসে। খগেশ্বরের মন্দির সেখান হইতে

ক্রোশ-খানেক্ দূরে। বিবাহের মাস পাঁচ-ছয় পরেই তিনকড়িকে না জানাইয়া তেনানী তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল।

তেনানী বলে, 'ও একেবারে অব্যর্থ। আসতেই হবে।'

লজ্জায় বাসনা একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসে। বলে, 'তবে তুইও একটা নিলিনে কেন পিসি ?'

'ওর মুখে আমি ঝাঁটা মারি !' বলিয়া মুখ ফিরাইয়া তেনানী একবার তিগুণীর মুখের পানে তাকায়। বলে, 'এই যে আমার সতীন-কাঁটা !'

বয়স তাহার ষোলয় গিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী। তিগুণী একবার হাসে। শুভ্র দাঁতের পংক্তি দেখা যায়। গাল দুইটি রাঙা হইয়া ওঠে।

এবারেও সতীনের জন্য তেনানীর অনেকগুলি টাকা খরচ হইয়াছে, কিন্তু পশুপতি নির্ব্বিকার।

অনেক দুঃখে সে-পথে সে চিরদিনের মত কাঁটা দিয়াছে। তিগুণীর আশা-ভরসা আর কিছু নাই।

তাই সে এবার বাসনাকে লইয়া পড়িয়াছে। নিজের না, বোনের না, এইবার ভাইঝির যদি কিছু হয়! ছেলে মেয়ে যা-হোক্ একটা কিছু ......ছেলে না হইলে কি আর মানায় গো! এ দুর্নিবার পিপাসা যেন আর কিছুতেই মিটিতে চায় না। নারীজন্ম মনে হয় বুঝি-বা ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিন্তু ভাই-ঝিরও কপাল মন্দ। তাহাকে লইয়াও আজ এই দুইটি বৎসর ধরিয়া কম টানা-পড়েন্ চলিল না।

তেনানীর সে কল্পিত রাজপুত্র ভোলানাথ কাঙাল-পুত্রেরও অধম হইয়া গেছে।

বিবাহের পর দেড়শটি টাকার মধ্যে পঞ্চাশটি টাকা বিধবা মা বোনের হাতে তুলিয়া দিয়া সেই

যে সে গ্রাম ছাড়িয়া উধাও হইয়া যায়,—ফিরিয়া আসে একটি বৎসর পরে। আসিয়াই মা-বোনের সঙ্গে ঝগড়া!

মা বলে, 'তুই যে একটি পয়সা দিবিনে, আমরা খাই কি?'

ভোলানাথ বলে, 'বৌ নিয়ে এসো। বছরে তিন মাপ করে' চাল আদায় কর, আর খাও।'

কিন্তু প্রস্তাবটা তাহাদের দিক্ হইতে আসিবার আগেই বাসনাকে তেনানী নিজে সঙ্গে লইয়া গিয়া সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।—'এই নাও বেয়ান, তোমার বৌ নাও!'

ভোলানাথ উঠানে বসিয়া জুতা ব্রুশ্ করিতেছিল, আড়-চোখে একবার তেনানী একবার বাসনার দিকে তাকাইয়া নাক সিট্‌কাইয়া বলিল, 'বছরে তিন মাপ চাল দেবার কথা, নিয়ে এসো আগে, নইলে মেয়ে তোমাদের ফিরে নিয়ে যাও!'

তেনানী বলিল, 'বিয়ে যখন করেছ বাবা,

তখন চাল দিলেও নিতে হবে, না দিলেও নিতে হবে।'

ভোলানাথ বলিল, 'মাইরি আর কি! ইয়ারকি বুঝি!'

কিন্তু জবাবটা যে এমন হইবে তেনানী তাহা ভাবে নাই। বলিল, 'বেশ। বাসনা রইলো। তারপর চাল তোমার শ্বশুরকে বলে' পৌঁছিয়ে দিয়ে যাব।'

ভোলানাথ তাহার জুতার উপর ব্রুশ্‌টা খুব জোরে জোরে ঘষিতে লাগিল।—'হ্যাঁ, শ্বশুর-বেটা ত' দেবে সবই! চামার কোথাকার, ছোটলোক! তিগুণীকে বিয়ে দেবে বলেই রাজি হয়েছিলাম। তা না হয় দিলে না। যাক্, না দিক্! কিন্তু এত বড় পূজো গেল ত এক জোড়া জুতো দিলে না,—একজোড়া ধুতি! একজোড়া জামা!—কিচ্ছু না! মা বোন্ যে ঘরে রয়েছে ত দশটা টাকা! তাও না!'

তেনানী বলিল, 'তুমি ত ছিলে না বাবা,

থাকলে না হয়,—দাদা না দিক্, দুখ্-ভিখ্ করে' আমিই দিতাম।'

ভোলানাথের বিধবা বোন্ বলিল, 'তা মা, দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল।'

ইহার উপর আর কথা চলে না। বাসনাকে রাখিয়া তেনানীকে সেদিন তাহার কৃপণ কঞ্জুষ দাদার আচরণের জন্য একটুখানি লজ্জিত হইয়াই বাড়ী ফিরিতে হইল।

দাদা ঘরে ছিল না। ফিরিয়া আসিলে বলিল, 'ভোলানাথকে তিন মাপ করে' চাল দেবার কথা, এবার ত' দিতে হয়।'

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'বেশ, দাও গে—!'

কিন্তু কথার অর্থ টা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তেনানী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিনকড়ি বলিল, 'ঘরে ত চাষ বলতে এই ক' বিঘে জমি! কিনে খেতে হয় না—এই পর্য্যন্ত। বছরে তিন মাপ করে' চাল···আর চালটা ত' তুই

নিজেই তখন দিয়ে দেব বলেছিলি কোনো রকমে। তাই যদি পারিস্ ত—'

'আমি কোত্থেকে দেব দাদা ?' আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু ইহার বেশি তেনানী আর কিছুই বলিতে পারিল না।

এমন সময় বিন্থ-বৌএর হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল, এবং উঠান পর্য্যন্ত আসিয়াই কি যেন ভুলিয়া আসিয়াছে—এম্নি ভাবে পুনরায় সে ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু এই যাওয়া-আসা তাহার নিরর্থক নয়। অনুচ্চকণ্ঠে দুজনকে শুনাইয়াই বলিয়া গেল, 'বোন হলে দিত, ভাই-ঝিকে কেউ কখনও দেয় ?'

তেনানীর বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিতেছিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, 'তুমি চুপ কর বৌ, তুমি কোন্ লজ্জায় বলছ ?'

কিন্তু বিন্থ-বৌ-এর লজ্জা না হইলেও তিনকড়ির হইল। বলিল, 'আহা-হা, চাল কি

আর আমি তোকে দিতেই বললাম রে বাপু? বললাম,—'ওটা, কথার কথা।······দেব কাকে শুনি? জামাইএর না আছে সাকিম না আছে মোকাম। বাসনাকে নিয়ে যাক্, ঘরে থাক্, রোজগার করুক, দু'একটা ছানা-পোনা হোক্··· আমি দেখি, তারপর দেব। জামাই-বেটিকে দিতে কি আর অসাধ? কিন্তু আমার বাপু এক কথা। পেটে এক, মুখে আর,—এসব পাবে না আমার কাছে। এক হাতে নেব, একহাতে দেব;—এই ত' জানি।'

কিন্তু তাহাকে দিতেও হইল না, নিতেও হইল না, জামাই ভোলানাথই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

দু'দিন গেল, তিনদিন গেল, ভোলানাথ দেখিল, চাল দেওয়ার নামগন্ধও কেহ করে না, তেনানী সেই যে মেয়েটাকে রাখিয়া গেছে, তাহার পর আর আসেও না, কিছু বলিয়াও পাঠায় না।

সেদিন রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। বাসনা নিশ্চেষ্টভাবে ঘুমাইতেছিল। ভোলানাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রথমে তাহার খোঁপার চিরুণী, কাঁটা, ফুল খুলিয়া লইল, গলার হার-ছড়াটা খুলিল, পরে হাতের বালা দুইটা খুলিতে যাইবে এমন সময় বাসনা জাগিয়া উঠিল। জাগিয়াই সে ভোলানাথের কাণ্ড দেখিয়া চেঁচাইতে গিয়াছিল। ভোলানাথ বলিল, 'চোপ্ !'

ভয়ে বাসনার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। হাতের বালা দুটা রহিয়া গেল।

ভোলানাথ বলিল, 'কার ?—এসব কার শুনি ?···তোর গায়ে এসব মানাবে কেন,—সুঁট্‌কি, কুঁইলি কোথাকার ! যার গায়ে মানাতো সে ত' আর,···যাক্। বাপ্‌কে বলে' চাল আদায় করে' নিয়ে এসো, এসে তোমার গয়না নিয়ে যেয়ো।'

বাসনা তাহার মাথার উপর অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল।

খানিক থামিয়া ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'তিগুণীর বর আসে? তোর পিসে? সেই ফোঁক্‌লা পশু?'

গহনার শোকে বাসনার চোখ দিয়া তখন জল আসিয়াছিল। পিছন ফিরিয়াই ঘোম্‌টাঢাকা মাথাটা সে বার-কতক নাড়িয়া জানাইল, আসে না।

ভোলানাথ আর কিছু না বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল। পরদিন সকাল হইতে না হইতেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাসনা তাহার সাড়ী ও সেমিজখানি গামছায় বাঁধিয়া লইয়া ছুটিয়া একেবারে বাপের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দম লইল।

কিন্তু এত বড় ক্ষতি তিনকড়ির পক্ষে বরদাস্ত করা সহজ নয়।

কন্যার মুখে গহনা কাড়িয়া লইবার কথাটা

শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ ভোলানাথের বাড়ীর দিকে ছুটিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

শুনিল, ভোলানাথ বাড়ী নাই এবং তাহার বিধবা ভগিনী এই গহনা কাড়িয়া লওয়ার কথা প্রসঙ্গে অভদ্র ভাষায় তিনকড়িকে যে-সব কথা শুনাইয়া দিল, তাহা শুনিয়া নীরবে চলিয়া আসা ছাড়া তাহার আর কোনও উপায় ছিল না।

তারপর ভোলানাথকে গ্রামে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মাস পাঁচ-ছয় আগে দিন-কতকের জন্য সে একবার আসিয়াছিল।

খবর পাইয়াই তেনানী বাসনাকে সাজাইতে বসিল।

বাসনা বলিল, 'না পিসি, না।'

'আ-মর্! সাধও ত' হয় না ছুঁড়ির!' বলিয়াই তেনানী তাহার মাথার চুলগুলা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া

চুপি-চুপি বলিল, গয়না কেড়ে নিক্, মারুক্ ধরুক্, যা খুশী তাই করুক্,—মরে' যাবি না, একটা ছেলে হোক্, দেখবি তখন, বলবি যে হ্যাঁ পিসি তখন বলেছিল।'

বাসনা সহজে যাইতে চায় না, তেনানী সেদিন রাত্রে তাহাকে সবার আগেই খাওয়াইয়া দিয়া একরকম জোর করিয়াই সঙ্গে লইয়া গেল।

ভোলানাথের মা যে কেমন-ধারা মানুষ কে জানে। কাহারো সঙ্গে বড়-একটা কথা কয় না, দিনরাত আপন মনেই বসিয়া বসিয়া ঝিমায়।

মুখ তুলিয়া ইহাদের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন কথাই সে বলিল না।

বিধবা বোন নাক সিটকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'আ, দিতে থুতে নেই শক্তি, পেসাদ পাবার ভারি ভক্তি!'

ভোলানাথ তখন আহারাদি শেষ করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া

তেনানী ও বাসনাকে আসিতে দেখিয়াই কোনও কথা না বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং আপন-মনেই উঠানটা পার হইয়া গিয়া সদর দরজার কাছ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আজ আর আমি ঘরে শোবো না মা, দরজায় খিল বন্ধ করে দিস্।'

বোন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'হলো ত? দিলে ত' তাড়িয়ে?'

তেনানী অবাক্।

কোনও রকমে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাইয়া দু'জনে যেমন আসিয়াছিল তেমনি চুপি চুপি বিদায় হইয়া গেল।

•

কিন্তু তেনানীর লজ্জা নাই।

পরদিন আবার!

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ভোলানাথের বোন রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের দেওয়ালে

8

ঘুঁটে দিতেছিল, তেনানী একা তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।—ঘুঁটে দিচ্ছ ভানু ?

ভানু মুখ ফিরাইয়া একবার 'হুঁ' বলিয়াই আবার তার নিজের কাজে মন দিল।

তেনানী বলিল, 'আসি কি আর সাধে মা ? আসি—বহুৎ দুঃখে আসি।..... দাদা ত' চামারের একশেষ, তা' ত জানো। কিন্তু আমরা মরি শুধু ওই মেয়েটার দুখে। বলি, আহা, যাই তবু নিয়ে, স্বামী পায় ত' পাক্।' বলিয়াই একটুখানি থামিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—'আজ একটি জিনিষ এনেছি মা তোমার জন্যে,'—বলিয়া পাঁচটি টাকা সে ভানুমতীর বাঁ-হাতের মুঠার মধ্যে অতি সন্তর্পণে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, 'হেই মা, তোমার হাতে ধরে বলছি মা, ভাইকে আজ আর যেন যেতে দিও না।'

টাকা হাতে পাইয়া ভানুর মুখের চেহারা তৎক্ষণাৎ বদ্‌লাইয়া গেল। এ যেন ঠিক যাদু-মন্ত্র! বলিল, 'দেখলে ত' মা কাল স্বচক্ষে ? আমরা ত কিচ্ছু বলিনি !'

তেনানী অত্যন্ত মিনতির স্বরে কহিল, 'তুমি মনে করলেই হবে মা, আজ শুধু তোমার হিল্লেতেই আসব। যেমন সময় এসেছিলাম ঠিক তেমনি সময়......'

ভানুমতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'এসো।'

বাসনা সেদিন কিছুতেই আসিবে না, তেনানী তাহাকে একরকম টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

তেনানী বলিল, 'চল্ মা চল্? আমরা মরি, আর তুই যে কি ধাতের মেয়ে, মা, কে জানে!'

বাসনা বলিল, 'কাল অম্‌নি-অম্‌নি তেড়েছিল, আজ ঝাঁটা খেয়ে আসবি।'

তেনানী বলিল, 'না, না, টাকা দিয়েছি! টাকা-বেটা পাথর-কাটা!—তা জানিস্?'

বাসনা ছেলেমানুষ, কিন্তু বাপের রক্ত গায়ে আছে। টাকার মহিমা সে জানে। কাজটা সেদিন কেমন যেন ঠিক যন্ত্রের মতই নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

ভোলানাথ সেদিনও ঘর ছাড়িয়া অন্যত্রে চলিয়া যাইতেছিল।

বোন বলিল, 'না, সে কি? আজকার মত থাক্। ধর্ম্মে পতিত্ হবি যে?'

মাও কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল।

ভোলানাথের আর যাওয়া হইল না। বাসনাও রহিল। রাত্রে রহিল। আবার দিনে চলিয়া গেল।

এমন শুধু একদিন নয়,—এমনি করিয়া চারদিন।

পাঁচদিনের দিন ভোলানাথকে তাহার চাক্‌রির জায়গায় চলিয়া যাইতে হইল।

বাসনা নিষ্কৃতি পাইল।

মাদুলির মাহাত্ম্যে কি না কে জানে!

মাস-দুই পরে জানা গেল, বাসনার ছেলে হইবে!

তেনানীর আনন্দ আর ধরে না! কিন্তু

তিগুণীকে দেখিবামাত্র আনন্দের উচ্ছ্বাসটা যেন একটুখানি কম পড়ে।

বাসনাকে দিনরাত চোখে-চোখে রাখিতে হয়। যখন যাহা খাইতে চায় তেনানী তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনে।

বিহু-বৌএর ঢেঁকিটা ভাঙিয়া দিলেও আজ-কাল সে আর কিছু বলে না। ননদের সঙ্গে পুকুরের ঘাটে জল আনিতে যায়। তিনকড়ির অসাক্ষাতে ভাগাভাগি করিয়া ডিম বিক্রি করে।

বিহু-বৌ বলে, 'এবার তোমার নাতি হবে।'

তিনকড়ি বলিল, 'তা না হলে কি আর সহজে ছাড়তাম মনে করছিস্? জামাইএর নামে নালিশ কর্‌তাম আমি।'

কথাটা শুনিবামাত্র বিহু-বৌএর মুখের চেহারাটা বদ্‌লাইয়া গেল।

তিনকড়ি পাকা লোক। তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'লোকে মন্দ বলতো? তা বলতো ত' বলতো, তাও ছাড়তাম না।'

'ওমা! সে কি গো?'

তিনকড়ি গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ। অতগুলো গয়না—বড় সহজ কথা নয়! ওর ওই মুখরা বোনটাকে দিতাম আসামী করে—বাস্! ছুট্‌তো আদালতে। মান-ইজ্জৎ সব বেরিয়ে যেতো।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিল, 'আমায় বলে কি না ফাঁকিবাজ; বলে, জোচ্চোর তুমি! এত বড় সাহস!'

তিনকড়ির রাগ তখনও কমে নাই। বলিল, 'করলাম না, না হয়, ছেড়েই দিলাম।—রাগের মাথায় করেই যদি ফেলতাম হট্ করে', সে কি নিজে আমি করতাম ক্ষেপী? করাতেন—। যিনি করাবার তিনিই করাতেন। 'আমি শুধু হেতু হতাম মাত্র।—করবার হেতু।'

যাক্—!

কিন্তু মাসখানেক পরে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।

বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্র তখন চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, এমন সময় পশুপতি আসিয়া হাজির! মাথায় একটা ভিজা গামছা, গায়ে সাদা চাদর, পায়ে চটি, এক হাতে হুঁকা, আর এক হাতে গামছায় বাঁধা ছোট একটি পুঁটুলি। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেছে। বেচারা একটুখানি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

তিনকড়ির সঙ্গে আলাপ-আপ্যায়নের পর, জল খাইয়া বিশ্রাম করিয়া একটুখানি সুস্থ হইয়া, পশুপতি বলিল, 'বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—তা প্রায় মাসখানেক্ হবে। এবার কিছু দিতে হবে ভাই, কন্যাদায়ে পড়েছি।'

তিনকড়ি নিতান্ত অন্যমনস্কের মত বলিল, 'হুঁ।'

একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না।

ভাবগতিক দেখিয়া বুঝা গেল, সে কিছু দিবে না।

পশুপতি কিন্তু তিনকড়ির ভরসায় আসে নাই।

আসিয়াছে যাহার ভরসায় সে ত' দেখাও দিল না, একটা কথাও বলিল না।

রাত্রে তেনানীর পরিবর্তে তিগুণী আসিল। দেখিয়াই মনে হইল, তাহাকে কোনোরকমে ঠেলিয়া-গুঁজিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু সে কি রূপ! কুমারী আজ যুবতী হইয়াছে।

পশুপতির মনে হইতেছিল, নিজের বয়সটাকে কোনোরকমে পিছাইয়া লওয়া যায় না? যাহা তাহার কোনোদিন মনে হয় নাই, আজ তাহার সেই কথাই মনে হইতে লাগিল।—ইহাকে বিবাহ করা বোধ করি তাহার উচিত হয় নাই।

পশুপতি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে বার-বার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছিল। এ যেন নিষ্প্রভ অঙ্গারের মত! উহাকে স্পর্শ করিতে ভয় করে। মনে হইতেছিল, প্রথম যৌবনে ইহাকে পাইলে বোধ করি সে তাহার এই ঘৃণিত বিবাহ-ব্যবসায়টা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিত, জীবনের

সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দারিদ্র্যকে সে হাসিমুখে বরণ করিত। কিন্তু যাক্,—আজ আর সেকথা নয়।

তিগুণীর হাতে ধরিয়া পশুপতি তাহাকে বিছানায় বসাইল। আলোটা দুজনের পক্ষেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পশুপতি নিজের হাতে লণ্ঠনটা নিভাইয়া দিয়া যেন খানিকটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

কিন্তু রাত্রির কথা প্রভাতে আর তাহার মনে রহিল না। তিগুণী উঠিয়া যাইতেছিল, পশুপতি খপ্ করিয়া বাঁহাত দিয়া তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিয়া, ডানহাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া টাকা যেমন করিয়া বাজায় তেমনি একটা ইঙ্গিত করিয়া বলিল, 'আছে? আছে কিছু তোমার কাছে? না, সেদিক দিয়ে নমস্পটং?'

তিগুণী কোনো প্রকারেই তাহার হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না, ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়াই লজ্জায় সে অধোমুখে নিজের পায়ের দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না। দিদিকে বলব।'

'বলব নয়, এক্ষুনি—এক্ষুনি বল গিয়ে। বল মস্ত এক কন্যাদায়,—পঞ্চাশ ; না হয় ত' শেষ,—তিরিশ। তা যদি পারে ত' আমি তোমাদের বাঁধা হয়ে রইলাম। মাইরি !'

আঁচলটা ছাড়াইয়া লইয়া তিগুণী চলিয়া যাইতেছিল। পশুপতি আবার হাঁকিল, 'শোনো !'

তিগুণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে মুখ ফিরাইল।

'উনি বুঝি আসবেন না ? ধরে নিয়ে আসতে পার ত' আমিই বলি।' বলিয়া একগাল হাসিয়া আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই তিগুণী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তেনানী আর আসে না !

টাকার কথাটা তিগুণীরও বলিতে লজ্জা করে। রাত্রে দেখা হইবামাত্র পশুপতি জিজ্ঞাসা করে, 'বলেছিলে ?'

তিগুণীর মুখ দিয়া ফস্ করিয়া একটা মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়ে। বলে, 'বলেছে—দেখব।'

পশুপতি বলে, 'দেখব নয়। কাল তুমি চেয়ে নিয়ে এসো।'

তিগুণী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে তাহার সম্মতি জানায়।

বিন্দু-বৌ বলে, 'আ-মর্! এ মিন্‌ষে মিছেমিছি বসে' কেন গা? বিদেয় কর্‌তে পার না যাহোক্ কিছু দিয়ে?'

তিনকড়ি বলে, 'হাতে আমার এক্‌টি পয়সা নেই বিন্দু।'

বিন্দু-বৌ হাসিয়া বলে, 'আমি দেব।'

কিন্তু তিনকড়ির মুখে হাসি ফুটে না। বলে, 'পয়সাগুলো ঘাসের বীজ্? কুড়িয়ে পাওয়া যায়;—না?'

তাহার পর ধীরে-ধীরে চোখ টিপিয়া বলে, 'চুপ করে' থাকো, আপনিই সরে' পড়বে একদিন।'

আশায় আশায় পশুপতির দিন কাটে।

পাঁচদিন কাটিল। কিন্তু আর নয়।

তেনানী সেদিন কি প্রয়োজনে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে, পশুপতি ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে ঘরে ঢুকিয়া তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

তেনানী চলিয়া যাইতে চায়, পশুপতি ছাড়ে না। বলে, 'কই, দাও!'

'কী?'—তেনানী মুখ তুলিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া চায়।

পশুপতি বলে,' টাকা। কেন, বোন তোমার বলেনি?'

রাগে ঘৃণায় তেনানীর মুখের চেহারা নিমিষেই অত্যন্ত কঠোর হইয়া ওঠে, বলে, 'অনেক টাকা খাইয়েছি তোমায়,—আবার টাকা? লজ্জা করে না?'

অনুনয়ের সুরে পশুপতি বলে, 'সত্যি, মাইরি, ভারি বিপদে পড়েছি। হ্যাঁ, দিয়েছ, দিয়েছ বই-কি, দাওনি তা ত আর—'

তেনানী রুক্ষস্বরে জবাব দেয়, 'ছাড়ো! ফের টাকা চেয়েছ কি, মুখে তোমার—' শেষের কথাটা সে আর উচ্চারণ করে না। পশুপতিকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া তেনানী ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

তবে আর আশা বুঝি নাই!

তিনকড়ির কাছে পশুপতি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল।—'দাও ভাই কিছু? যৎসামান্য,—যা পার। আজ উঠব ভাবচি।'

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হায়, হায়, ভগবান এমনি মার মেরে রেখেচেন আমায়, সে আর কি বলব পশু, বলা না-বলা আমার দুই-ই সমান। একটি পয়সা নেই আমার কাছে ভাই, একটি আধলা পয়সা নেই! তবে ভগবান যদি দিন দেন কোনোদিন, ত চাইতে হবে না,—আমি নিজে থেকেই পাঠিয়ে দেব তোমায়।... আজ উঠ্‌চো? তা আজকার দিনটা...কিন্তু আবার এসো যেন। বাসনার সন্তানাদি হবে,

অন্নপ্রাশনের চিঠি পেলেই···বুঝলে?···শ্রীহরি! শ্রীহরি!’

পড়্‌তা নেহাৎ মন্দ। মনে মনে তিনকড়িকে গালাগালি দিতে দিতে বেচারা খালি-হাতেই বিদায় হইয়া গেল।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত হইলেও আনন্দের—।

কিন্তু এই আনন্দের সংবাদটিকে লইয়া বিন্দু-বৌ তাহার সংসারটির মধ্যে ভয়ানক একটা নিরানন্দের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

সংবাদ এমন কিছুই নয়। তিগুণীর ছেলে হইবে,—এই সংবাদ।

বিন্দু-বৌএর তাহা সহ্য হইল না। তেনানীর সঞ্চিত অর্থগুলি যাহাতে বে-হাত হইয়া না যায় তাহার জন্য এতদিন ধরিয়া এত চেষ্টা, এত অভিসন্ধি যে এমন করিয়া হঠাৎ একদিন ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহা সে ভুলিয়াও কোনোদিন ভাবিতে পারে নাই।

তিনকড়িকে বলিল, 'হলো ত'? হলো ত' এবার? ভগ্নীপতিকে বসিয়ে রাখার সাধ মিট্‌লো ত? নাও, এবার বোনের টাকা নেবে বল্‌ছিলে, নাও!'

তিনকড়িও প্রমাদ গণিল, কিন্তু হাল ছাড়িল না। বলিল, 'দাঁড়াও, আগে হোক্‌, বাঁচুক্‌, বড় হোক্‌,—বহুৎ দেরি! ভগবান আছেন মাথার ওপরে, দ্যাখ না কি হয়!'

'আ-র তোমার ভগমান! ভগমানের মুয়ে মারি ঝাঁটা!'

তাহার পর, এটা ওটা সেটা লইয়া প্রতিদিন তেনানীর সঙ্গে তাহার কথা-কাটাকাটি চলিতে থাকে। একটা-না-একটা ছুতা লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি প্রায়ই হয়। এবং হয় যখন, তখন একেবারে চরমে গিয়া পৌঁছে। তিনকড়িও ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাহাতে সায় দেয়।

শেষে একদিন এমন হইল যে, একেবারে

ছায়া-কাটাকাটি! এ উহার ছায়া মাড়াইবে না, উহারাও যেন ইহাদের ছায়া না মাড়ায়।

ঝগড়ার সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সামান্য ব্যাপার লইয়া। দিন-তিনেক আগে ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়া তেনানীর হাত হইতে বাসনগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া দৈবাৎ পড়িয়া যায়। অনিষ্ট বিশেষ কিছুই হয় নাই, একটা কাঁসার বাটিতে একটুখানি চিড় খাইয়া গিয়াছিল মাত্র।

বিন্থ-বৌ তাহার অপমানের বাকি কিছুই রাখিল না। তেনানী তাহার দোষ স্বীকার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এক পক্ষ চুপ করিয়া থাকিলে অপর পক্ষের সুবিধা বিশেষ কিছু হয় না। তাই বিন্থ-বৌ তাহার এই অন্যমনস্কতার একটা সন্তোষজনক কারণ আবিষ্কার করিয়া সকলের সমক্ষেই তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। হরিমতির স্বামী আসিয়াছে, সেই যে ছুঁচলো দাড়িওয়ালা যাত্রার দলের মিন্‌ষে,—মিন্‌ষের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়,

এবং তাহারই সঙ্গে তেনানীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ত' বহুদিন হইতে আছেই, এমন-কি বোন্‌টাকেও সেইখানে ভিড়াইয়া দিয়া তাহার দাদার নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক বংশে একটা দুরপনেয় কলঙ্ক আনিয়া দিল। তাহারই কাছে মন যাহাদের চব্বিশ ঘণ্টা পড়িয়া থাকে, তাহারা অন্যমনস্ক হইয়া পুকুরের ঘাটে বাসন ভাঙিবে না ত' কি করিবে? ইহা শুধু তাহার মুখের কথা নয়, ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ সে বহুদিন পাইয়াছে, কিন্তু অনর্থক একটা কলঙ্কের ভয়ে এতদিন চুপ করিয়াই ছিল; আজ যখন বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি, তাহাই ঢাকিবার জন্য গোপনে গোপনে লোক পাঠাইয়া টাকা ঘুষ দিয়া পশুপতিকে পর্য্যন্ত আনা হইল, তখন আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তেনানী একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল!—ঝগড়াটা রীতিমত পাকিয়া উঠিতে বেশি দেরি হইল না, এবং ক্রমশ হাতাহাতি

হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া তিনকড়ি নিজেই উঠিয়া আসিয়া ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিল।

তেনানী তিগুণীকে কিছু চাল ও খানকতক বাসন দিয়া পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইল।

তেনানী তিগুণী আলাদা থাকে, আলাদা আপনার রাঁধে, বাড়ে, খায়,—কোনোরকমে দুখ্-ভিখ্ করিয়া দিন চালায়। দাদা, বৌ, এমন কি বাসনার সঙ্গেও বাক্যালাপ বন্ধ। বাসনা লুকাইয়া লুকাইয়া পিসিদের সঙ্গে কথা কহিবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাপ-মায়ের প্রচণ্ড শাসনের ভয়ে তাহা পারে না।

সুখে দুঃখে কয় মাস পার হইয়া গেল।

হঠাৎ রাত্রে সেদিন বাসনার প্রসবের ব্যথা জানাইল।

যাতনায় অস্থির হইয়া বাসনা ছট্‌ফট্ করিতে-ছিল। শরের ঝাঁপ্ ফেলিয়া চালার একপাশে

আঁতুড় ঘর তৈরী হইয়াছে। বেশি দূরে নয়। তেনানী একবার দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে কুকুর বিড়াল তাড়ানোর মত বিদু-বৌ তাহাকে দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সেই অবধি তেনানী তাহার ঘরের মেঝেয় বোনের কাছে চুপ করিয়া শুইয়াছিল, চোখে তাহার ঘুম আসিতেছিল না।

বাসনার চীৎকার কানে আসিতেই হঠাৎ সে ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল।

বাসনা ডাকিতেছে,—'পিসি! পিসি!'

তাহার সে আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর থাকা চলে না। তেনানী উঠিয়া দাঁড়াইল। তিগুণী পোয়াতি মেয়ে, একা ঘরে থাকিতে নাই, বলিল, 'চল্‌ দিদি—আমিও যাই।'

দু'জনেই গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না।

ঝাঁপের ফাঁকে বিদু-বৌ দেখিতে পাইয়াছিল। সেইখান হইতে শুনিতে পাওয়া গেল, 'লজ্জাও

ত' নেই মা। বেহায়া ছুঁড়িরা সব! আসিস্ ত' 'তোর ওই ভালবাসা-বোনের মাথা খাস্, বোনের পেটে যে আসছে তার মাথা খাস্!'

কিন্তু তেনানী তাহা পারে না। সুতরাং তাহাকে ফিরিতে হইল। তিগুণীও ফিরিল।

সারারাত আর কাহারও ঘুম হইল না। ঘরের চালায় বসিয়া সবই শুনিতে লাগিল, কিন্তু স্বচক্ষে দেখিতে কিছুই পাইল না।

শুনিল, বাসনার একটি ছেলে হইল। মেয়ে নয়—ছেলে। সুন্দর ছোট্ট ছেলেটি! বিকলাঙ্গ নয়, কালো নয়, কুৎসিত নয়, চোখ, নাক, মুখ, হাত, পা,—মায়ের মত কিছুই হয় নাই, বাপের মত কোঁক্‌ড়ানো একমাথা কালো চুল, ঢল্‌ঢলে চোখ, —ছেলের কান্নার শব্দ শোনা গেল। তেনানীর মনে হইতেছিল, বিন্থু-বৌএর গলাটা টিপিয়া তাহাকে ওইখানে খুন করিয়া ছেলেটাকে একবার দেখিয়া আসে……

কিন্তু ছেলে ত' দেখিতে পাইলই না ; এমন কি, বাসনাকে একটিবারের জন্য দেখিতে পাওয়াও সাধ হইল।

কিন্তু তাহাও হইবার নয়। শুনিল, তাহার নাকি জ্বর হইয়াছে। প্রসবের পর হইতে সেই যে আঁতুড়-ঘরের মেঝের উপর গা এলাইয়া দিয়াছে, তাহার পর আর উঠিতে পারে নাই। লোকে নাকি ডাক্তার দেখাইবার পরামর্শ দিতেছে।

দুপুরে ছেলে দেখিবার জন্য ভোলানাথের মা আসিয়াছিল,—বিধবা বোন ভানুমতি আসিয়াছিল। চার আনা পয়সা হাতে দিয়া ঠান্‌দিদি তার নাতি দেখিয়া গেছে।

যাবার পথে ভানুমতি একবার তেনানীর সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। বলিল, 'দেখা পেলাম না যে তোমার দাদাটির! দেখতে পেলে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে যেতাম!······কেন, হরিমতির ইয়ে আবার কোন্ যুগ্যের মানুষ মা, যে, তার কাছে যেতে হবে?······শুনেছি মা, সবই শুনেছি।

এপাড়া-ওপাড়া হলেও কথা কখনও চাপা থাকে না।'

লজ্জায় তেনানীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, একটি কথাও বলিল না। চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া পা মেলিয়া বসিয়াছিল; সুন্দর সুডৌল নিজের পা-দুইটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল মাত্র। খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভোলানাথের খবর কিছু পাস্‌নি ভানু?'

ভানুমতি বলিল, 'ওই দ্যাখো! তোমরাও শুনেছ তা হ'লে? কিন্তু ওসব গুজব, মা, গুজব। কি শুনেছ বল ত?'

তেনানী অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, 'কই কিছুই ত' শুনি নি!'

ভানুমতি বলিল, 'বলছে সব,—গাঁয়ে নাকি তিন-চারজন পুলিশ এসেছিল, কনেষ্টোবল্ এসে-ছিল। কিন্তু কই, আমরা ত' কিছুই দেখ্‌তে পাইনি মা, চব্বিশ ঘণ্টা বাইরে বাইরেই ত' থাকি।'

তাহার পর আবার বলিল, 'ভোলানাথ মুখুজ্যের ঘর খুঁজ্‌ছিল। ঘরে কে কে আছে, কখন আসে, স্বভাব চরিত্তি কেমন, এই সব কথা নাকি শুধিয়ে গেছে।—তা, অন্য ভোলানাথ হতেও ত' পারে। আমাদের ভোলানাথ, তাই-বা কে বল্‌লে মা! কত গাঁয়ে কত ভোলানাথ আছে!'

তেনানী বলিল, 'কেন, কি হয়েছিল? কি করেছিল কি?'

'কে জানে মা, লোকে বলচে, তাই শুন্‌চি। বলে কিনা, কোথাকার একটি খুব সুন্দরী মেয়ে বার করে' নিয়ে পালাচ্ছিল, পথে ধরা পড়েছে, তারই নাকি মকদ্দমা চল্‌ছে কলকাতায়।······ কিন্তু হ্যাঁ মা, এত-সব যদি হবে ত' আমরা জানব না কেন? ওই সব দারোগা-টারোগা কি আর আমাদের না শুধিয়ে যেতো কখনও? হ্যাঁ মা, কই তুমিই বল দেখি?'

তেনানী অবিশ্বাস করিল না। হয়ত বা

হইতেও পারে! তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

বাসনার জ্বর ছাড়িয়া বিকার হইল, বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল, চুল ছিঁড়িতে লাগিল, আরও কত-কি যে করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বলে, ডাক্তার দেখাও, কেহ বলে, ভূতে পাইয়াছে।

ক্রোশ পাঁচ-ছয়ের ভিতর ডাক্তার কোথাও নাই। শহর হইতে আনিতে গেলে খরচ অনেক। ভূতে পাওয়ার কথাটাই তিনকড়ির ঠিক মনে ধরিয়া গেল।

বুধপুর হইতে ওঝা আসিল।

তিনকড়ি একটি পাথরের বাটিতে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত-জল একটুখানি খাওয়াইয়া দিয়া বলিল, 'সারে ত' এতেই সারবে, আর না সারে ত' হাতী বেঁধে দিলেও নয়।'

কিন্তু ওঝাও সারাইতে পারিল না, চরণামৃতেও সারিল না।

পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় আপনা হইতেই বাসনার সমস্ত যন্ত্রণা ধীরে-ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল। শেষ ধাক্কা সামলাইতে গিয়া চোখের তারা দুইটা উল্টাইয়া ফেলিল, চোয়ালের পাশ দিয়া খানিক্‌টা জিব তাহার বাহির হইয়াই রহিল। গা, হাত, পা, বরফের মত ঠাণ্ডা—হিম! ডাকিয়াও কেহ সাড়া পাইল না।

ঘরে একটা কান্নাকাটির রব উঠিল।

তিনকড়ি কাঁদিল। বিদু-বৌ গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

বাসনা মরিয়াছে শুনিয়া তেনানী তিগুণীর রাঁধা ভাত সেদিন পড়িয়া রহিল।

তেনানীর কান্না কিছুতেই আর থামিতে চায় না।

নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে, আর একবার

করিয়া সেইখানে ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতে চায়। তিগুণী তাহার হাতে ধরিয়া বসাইয়া রাখে। বলে, 'না দিদি, বৌএর মুখ আর দেখিস্‌নে।' বলে, 'বাসনাকে জীয়ন্ত দেখতে দিলে না, মরা দেখে' আর হবে ছাই!'

সত্য কথা। যে অপবাদ বিহু-বৌ তাহাদের দিয়াছে,—তাহার মুখ আর না দেখাই উচিত। দেখিতে ইচ্ছাও নাই। কিন্তু বাসনা···হায় হায়—

তেনানী তাহার মরা মুখখানি দেখিবার জন্যই বোধ করি ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকে।

কিন্তু এক উঠানে মানুষ মরিয়াছে, তাহার উপরে ভাইঝি,—পোয়াতিকে চোখে চোখে রাখিতে হয়।

তিগুণীকে লইয়া তেনানী বেড়াইতে যায়। ইহার উহার ঘরে বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়।

গল্প করে, কাজ করিয়া দেয়, আর বাসনার কথা উঠিলেই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদে।

লোকে বলে, 'ছেলেটি কেমন হয়েছে তেনানী? আহা, তবু ওই গুঁড়োটুকু বেঁচে থাক্! তবু মায়ের নাম রইবে।'

তেনানী চুপ করিয়া থাকে।

নানান্ লোকে নানান্ কথা বলিতে ছাড়ে না।

বলে, 'আঁতুড়ের পোয়াতি মলে শাঁকচুন্নি হয়। আমরা দেখেছি।' কেহ বলে, 'ছেলের মায়া কি ছাড়তে পারে মা,—দিনরাত ওই ছেলের কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়।'

কেহ-বা হাত-পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসে। —'আমাদের জানা কথা মা,—আমাদের গাঁয়ে, শোনো তবে, এক জা আর এক ননদ; একই বয়েস,—খুব ভাব দুজনে। দুজনেই পোয়াতি। প্রথম পোয়াতি,—ভারি ভয়। দুজনে চান্ করতে গেল। চান্ করতে গিয়ে পুকুরের ঘাটে

বলাবলি হলো। এ বললে, তুই যদি ভাই মরিস্ ত, আমায় ডাকিস্, আমি মরলে তোকে ডাকব। বাস, ঠিক তাই! অবাক্ মা. আমরা ত' অবাক্!' বলিয়া গালে হাত দেয়। দিয়া বলে, 'হুঁ, তাই গেল মা। এ গেল একদিনে,—ও গেল একদিনে।'

তেনানী যাহা ভয় করে, তিগুণী যাহা শুনিতে চায় না, যাহার জন্য ঘরে বাস নাই,—টকের ভয়ে পলাইয়া আসিয়া তেঁতুল-তলায় বাসা বাঁধিয়াছে।

তেনানীকে সকলে সাবধান করিয়া দেয়।— 'দেখিস্ মা, চোখে-চোখে রাখিস্ যেন।'

তিগুণীকে বলে, 'ভয় কি? ভয় তোমার কিসের?'

দুঃখের দিনে হাসি আসে না, তিগুণী তাই চুপ করিয়া শোনে।

শৈশবের সঙ্গী বাসনা যেন তাহার চোখের সুমুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসে।

বেশি দিন নয়,—দিন দুই তিন পরে।

প্রদীপ জ্বালিয়া তেনানী বাহিরের দুয়ারের কাছে সন্ধ্যা দেখাইতে গেল। তিগুণী তখন হেঁসেলের কলসী হইতে জল গড়াইয়া খাইতেছিল।

হঠাৎ কি একটা শব্দ হইতেই তিগুণী একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখে,—প্রদীপের স্বল্পালোকে ভাল দেখাও যায় না,—অতি জীর্ণ মলিন একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া বাসনা দাঁড়াইয়া আছে। সেও যেন হাত বাড়াইয়া জল খাইতে চায়।

চম্ করিয়া মাথাটা তাহার ঘুরিয়া গেল। গেলাসটা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া তিগুণী ছুটিয়া পলাইতে যাইবে, পিতলের একটা জলভর্ত্তি কল্‌সীর গায়ে পা ঠেকিয়া টাল্ খাইয়া উপুড় হইয়া, পড়িল, অস্ফুটকণ্ঠে চোখ বুজিয়াই একবার ডাকিল,—'দিদি!' মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, পেটের যন্ত্রণায় তখন সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। গল্ গল্ করিয়া কাঁচা-রক্ত ভাঙিয়া কাপড়টা তাহার ভিজিয়া যাইতেছিল।

তেনানী আসিয়া দেখে—সর্ব্বনাশ !

তিগুণী বলে, 'পড়ে গেলাম দিদি।'

তেনানী থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, আর শুধায়, 'হাঁরে ভয়-টয় কিছু—?'

যন্ত্রণায় তিগুণী আর কথা বলিতে পারে না। ঘাড় নাড়িয়া জানায় যে, না—সে-সব কিছু নয়।

কিন্তু একা এ বিপদ সে সাম্‌লায় কেমন করিয়া ?

কাঁদিয়া-কাটিয়া ছুটাছুটি করিয়া তেনানী পাড়ার মেয়ে জড়ো করিয়া ফেলিল।

কেহ বলিল, 'জল দাও।'

কেহ বলিল, 'সেক্—'

কেহ বলিল, 'কিছুই করতে হবে না!—'

কেহ বলিল, 'কাঁদিস্‌নে মা, ছেলে হবে।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রে তেনানী দু'চার জন পাড়া-পড়শীর হাতে ধরিয়া, কাঁদিয়া, খোসামুদি করিয়া, তাহার কাছে রাখিল। সারারাত ধরিয়া আগুনের সেক্ চলিতে লাগিল।

লোকে বলে, 'আচ্ছা বৌ, আর আচ্ছা দাদা যাহোক্! আচ্ছা গল্প ছিল মা তোমার মায়ের !'

পরদিন বেলা তখন প্রায় দশটা। তিগুণী এপাশ-ওপাশ করে, দিদির মুখের পানে একদৃষ্টে তাকায়, আর দু'-চোখের কোণ বাহিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে,—সোজা সত্য কথাটা তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আগাইয়া আসে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই সে বলিতে পারে না।

বলিল যখন—তখন প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। তেনানীর কোলে মাথা রাখিয়া হাতখানা তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তিগুণী ডাকিল, 'দিদি !'

চোখের জলে দিদির চোখের দৃষ্টি তখন ঝাপ্সা হইয়া গেছে।

অতিকষ্টে তিগুণী বলিল, 'আমি আর বাঁচব না দিদি।' বলিয়া ঘন ঘন সে তাহার মাথাটা

এপাশ-ওপাশ করিয়া নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ চুপ করিল।

দিব্য সজ্ঞানে কথা কহিতে কহিতে তিগুণী মরিয়া গেল।

মাথাটাকে বারকয়েক নাড়িয়া চাড়িয়া, তুলিয়া ধরিয়া, চুমা খাইয়া কথা কহিয়া, তেনানী কোনপ্রকারেই যখন আর তাহাকে কথা কহাইতে পারিল না, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া গিয়া তিনকড়ির পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল।—'ওগো দাদা গো—একবার দেখে যাও গো!'

বিতু-বৌ বলিল, 'ওমা একি জ্বালা গা! বোনকে আজ ডাক্তার দেখাতে হবে, তাই ছুটে এসেছেন গরবী—'

কথাটা সত্য। কিন্তু এতদিন তিনকড়ি কিছু বলিবার সুযোগ পায় নাই। আজ সে হঠাৎ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তেনানীকে গালাগালি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং ডাক্তার

দেখাইবার প্রসঙ্গটা এড়াইবার জন্য সেখান হইতে খানিকটা সরিয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'ডাক্তার! ডাক্তার না আরো-কিছু! পয়সা দেখেছেন সব—আমার পয়সা দেখেছেন।'

কিন্তু ডাক্তার দেখাইবার প্রয়োজন তখন আর নাই, পয়সা দেখিবার জন্যও নয়,—তিগুণী যে মরিয়াছে, কথাটা তিনকড়ির জানিতে বেশি বিলম্ব হইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তেনানী ত' জানাইয়া দিলই,—কান্না শুনিয়া পাড়ার কয়েকটা মেয়ে ছেলেও আসিয়া জড়ো হইল।

তিনকড়ির রাগ তখন খানিকটা পড়িয়াছে।

যাহা করিবার, তাহাকেই সব করিতে হইল। লোকজন ডাকিতে কাঠ-কয়লার জোগাড় করিতেই বেলা পড়িয়া গেল। তাহার পর তিগুণীকে বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া ঘর হইতে যখন বাহির করিল, তখন সন্ধ্যা।

কিন্তু একই ঘরে দুইটা মেয়ে এমন করিয়া

আগে-পিছে মরিয়া যাওয়া,—এমন কাণ্ড প্রায়ই ঘটে না। গ্রামের লোক তাহার বাড়ীর পাশে প্রকাণ্ড ঐ নিম গাছটার দোষ দেয়। দেবতার আশ্রয়—অত বড় নিমের গাছ—তিনকড়ি এত বুদ্ধিমান হইয়াও উহাকে যে কেন এতদিন কাটিয়া ফেলে নাই—কে জানে!

দুইটি মানুষের অভাবেই ঘর যেন শ্মশান!

তেনানী আর বিদু-বৌ—দুজনে আজকাল আবার একসঙ্গেই থাকে বটে, কিন্তু কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। তিনকড়ি বাহিরে বাহিরেই কাটায়।

বিদু-বৌ তাহার নাতির নাম রাখিয়াছে—দুখিরাম। দুখু বলিয়া ডাকে। দু'মাসের ছেলে—গাইয়ের দুধে মায়ের দুধের পিপাসা মিটে না,—ছেলেটা তাই হাঁ হাঁ করিয়া এদিক-ওদিক চায় আর কাঁদে; আবার কখন্ আপনা হইতেই আঙুল চুষিতে চুষিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিদু-বৌকে

বুঝাইয়া বলে, 'ভগবানের ইচ্ছায় সবই ত' হলো বিছু-বৌ। বলেছিলাম যা, সবই হলো। তেনানীর টাকা, সেই আমার কাছেই ফিরে এলো ছাখো! যাবার মধ্যে গেল শুধু আমার মেয়েটা।···তবু যাহোক্ একটা চিহ্ন রেখে গেছে, এই যা সান্ত্বনা।'

বিছু-বৌ কাঁদিয়া, দুঃখ করিয়া বলে, 'কিন্তু ধন্যি পাষাণ তোমার ওই বোনটি যাহোক্! বাসনা মলো ত' একবার দেখতে পর্য্যন্ত এলো না! এখন আবার খোসামুদি করে আসে দুখিরামকে নিতে। আমি বলি,—না, তোর অত সোয়াগে কাজ নেই বোন।'

তিনকড়ি বলে, 'দিয়ো না, দিয়ো না। জব্দ হোক্।'

সস্তায় একটি গাইএর সন্ধানে কয়েক দিন হইতে তিনকড়ি খুব হাঁটাহাঁটি করিতেছিল। সেদিন কি-একটা দূরের গ্রামে গিয়া রাত্রে আর ফিরিতে পারে নাই।

বেলা প্রায় দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বিন্দু-বৌ মাথা চাপ্‌ড়াইয়া বুক চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

শুনিল, দুখিরামকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গত রাত্রে বিন্দু-বৌ যখন ঘুমাইতেছিল, সেই অবসরে ছেলেটাকে চুরি করিয়া লইয়া তেনানী কোথায় চলিয়া গেছে, কেহ তাহার কোনও সন্ধান দিতে পারিতেছে না। এবং শুধু ছেলে নয়, রাজু বাউরির কাছে ছাগলের দরুণ আড়াইটি টাকা ছাড়া তেনানীর সঞ্চিত যাহা কিছু—কিছুই সে এখানে রাখিয়া যায় নাই।

'হা ভগবান!' বলিয়া তিনকড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিল, এবং চোখের তারা দুইটা উল্টাইয়া মাথার উপরে শূন্য বায়ুস্তরের মধ্যে কাছাকাছি কোথাও ভগবানের সন্ধান করিতে লাগিল বোধ হয়।

কেলেঙ্কারী

এমন কিছু সোণাদানা ত' নয়—

•···কচুর খানিকটা তরকারি।

'তা ফেলছে ত' আর কি হবে মা ?'

'না মা না, তোমরা সব তু-চুচ্‌কোর দল তোমরা চুপ কর। হারামজাদী ফেল্‌বে কেনে তাই শুনি।'

সালিস্ যিনি করিতেছিলেন, রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন।—'তবে তাই যা-খুশী তাই কর মা!'

সতীনে সতীনে ঝগড়া। ছোট সতীন এঁটো বাসনের সঙ্গে বাসি কচুর তরকারি খানিকটা ঘাটের জলে ফেলিয়া দিয়াছে। বড়র মুখে হাত দেওয়া দায়।

'যে মুখে বল তুমি দরিদ্দ বাস্তুণী, আবার সেই মুখেই বল তুমি চ্যাং মুড়ী কানি! কত ঢংই না জানো মা তোমরা!···আমার কাছে আমার মতন—ওর কাছে ওর মতন···'

মেয়েটা তখন চলিয়া গিয়াছিল—তাই রক্ষা।

কিন্তু ছোট সতীনের কথা বলিবার অবসর ছিল না।—শীতের সকালে উত্তরে বাতাস বয়, পুকুরের জল যেন ঠাণ্ডা হিম হইয়া থাকে। তার উপর এক বোঝা বাসন। বালি দিয়া না মাজিলে কাঁশার গেলাসের দাগ ওঠে না। হাতের চামড়া হাজিয়া যায়—হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত কন্ কন্ করিয়া ওঠে।

তবু একবার মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করে, 'এই আলুমিনির বাটিটা বালি দিয়ে মাজব দিদি?'

দিদি তখন হুঁকার গুল্ দিয়া দাঁত মাজে। মাজিতে মাজিতে ব্যাজার হইয়া বলে, 'বালি দিয়ে না পাথর দিয়ে তা আমি কি জানি লা? আমি কি জানি?'

ঠোঁট উল্টাইয়া থুতু ফেলিয়া আবার বলে, 'তখনই শীল মা তখনই শীলা,—কে জানে মা তোমার নীলা!'

বলিয়াই চুপ করিয়া থাকে।

জয়া আবার হেঁট মুখে বাসনের গাদায় হাত দেয়। পুকুরের পাৎলা জলে তাহার মুখের চেহারা দেখা যায়। কপালের চুলগুলা বাঁ-হাতের মুঠা দিয়া সরাইয়া লইয়া আবার সে বাসন মাজিতে স্থরু করে।

বড়-সতীন তাহার মুখ হইতে কালো গুলের থুতু খানিকটা ফেলিয়া দিয়া হাতের ইসারা করিয়া ডাকে, 'কে রে ও ছেলেটা! কে রে তুই? দে বাবা ছাগলটাকে দিগ্‌দড়ি দিয়ে বেঁধে ওই খানে। নইলে দেবে হয়ত' এখুনি শেয়ালে খেয়ে। দে বাবা!'

মুচিদের ছেলেটা তেঁতুলতলার দিকে চলিয়া যায় ; কথা শোনে না।

'কাকে ডাক্‌চিস্ লা ? কে ও ?'

বড়-বৌ মুখ ফিরাইয়া বলে, 'আর দেখ্‌চ কি মা, মুচিদের ওই ছোঁড়াটাকে এত করে' ডাক্‌ছি, ত' ভুলে একবার পিছন্ ফিরুক্......'

বেঁটে-কামিনী শীতের ভয়ে কাপড়ের ফাঁকে মাত্র চোখ দুইটি বাহির করিয়া ঘাটের কাছে রৌদ্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'ওরা ভালো আজ কথা শোনে! ঘুমিয়ে উঠে দরজা খুল্‌তে যাই, দেখি না—ওমা, অভয়ার সেই মরা গরুটাকে কাঁধে করে' নিয়ে আসচে ভাগাড় থেকে তুলে। বলি—তা আমার দরজা দিয়ে কেন্ রে মুখ-পোড়া ? বললাম ওই ডোম্‌না খাল্-ভরাকে! তা হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল। বাটি বাটি মাংস খাবে আজ এই শীতের দিনে,—কথা আজ ভালো শোনে ওরা কেউ!'

নাক মুখ সিঁট্‌কাইয়া বড়-বৌ ঘৃণায় খানিক্‌টা

থুতু ফেলিল। বলিল, 'না মা, ঘরের কাছে রয়েছে, বাসি ভাত-তরকারি খারাপ হয়ে গেলেই ডাকি, বলি, ও ডোম্‌নার বৌ, নিয়ে যা, ও রুহিতের মা, থালা নিয়ে আয়! দেব এইবার ভাল করে',—মুয়ে নুড়ো জ্বেলে দেব। বলি, ছাগলটা ধান-মাঠে চরছে, দিগ্‌দড়ি দিয়ে দে বাছা—নইলে এখুনি শ্যালে ধরবে, তা কে কার কথা শোনে! এত গরব! ছেলেটাকে চিন্‌তেও পারলাম না যে ছাই—ওই সূয্যির জ্বালায়······'

পাকা ধানের মাঠের ওপর সূর্য্য তখন অনেকখানি উঠিয়াছে বটে,—ঠিক্ একেবারে চোখের সুমুখে।

কামিনী বলিল, 'শেয়ালের কথা আর বলিস্ না মা! শেয়ালের জ্বালায়—হাঁস ছিল আমার তিন গণ্ডা—এখন সবে পাঁচটিতে ঠেকেছে, তিনটি হাঁসা আর দুটি হাঁসিন্। খদ্দের পাই ত বেচে দিই।'

মুখ ধুইবার জন্য বড়-বৌ খেজুর গুঁড়ির পাটের

উপর গিয়া বসিল। বলিল, 'আ! পয়সা কত গাঁয়ের লোকের! হাঁস খাবে! পায়রা পায় না —হাঁস খাবে!'

রোদ পাইয়া কামিনী এতক্ষণে মুখের ঢাকা খুলিল; বলিল, 'শীতকাল, এই সময়েই ত' হাঁস খাবার সুখ।'

রাজুবালা ঘাটে জল লইতে আসিয়াছিল, ভর্ত্তি কলসীটা কাঁকে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'সব্বনাশীরা যে ধান খায়! ধান খেয়ে খেয়ে দিব্যি ভোগা ভোগা গতর হয় কেমন। তুমিও ধান খাও কামিনী পিসি, দেখবে তোমারও অমনি গতর হবে।'

কামিনী বলিল, 'আ মর্! পিসি হই যে লা?'

রাজুবালা মুখ ফিরাইয়া কদম গাছের তলা দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়।

'দিদি!'

মুখ ফিরাইয়া দিদি দেখে, ভাত-তরকারির লোভে পুকুরের হাঁসগুলা একেবারে হাতের কাছে আসিয়া চরিতেছিল—জয়া তাহাদেরই একটাকে জাপ্‌টাইয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

'ছেড়ে দে—ছেড়ে দে সব্বনাশী! কার না কার হাঁস—ঝেঁটিয়ে এখুনি বিষ ঝেড়ে দেবে, জানিস্? হাঁসের নামে নোলায় তোর জল সোরলো বুঝি?'

হাঁসটা জয়া ছাড়িয়া দিতেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া সে তাহার দলে গিয়া ভিড়িল। অন্য হাঁসগুলা তখন দূরে একটা শালুক-ঝাড়ের কাছে।

কামিনী মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আ আমার মরণ! অত বড় ধিঙ্গি মেয়ের আক্কেল নেই গা? তা নইলে কি আর সাতছেলের বাপের হাতে পড়ে কখনও?'

গাল দুইটা জয়ার রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া আবার সে আপন-মনে বাসন মাজিতে লাগিল।

বড়-বৌ বলিল, 'আক্কেল দিব্যি আছে মা, আক্কেল দিব্যি আছে! সতীর বাপের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করবার বেলা ত' বেশ!···ন্যাকা ন্যাকা পেয়াদা,—আসামী ধরতে জেয়াদা! আ মর্ সব্বনাশী! দক্কসি! মর্ মর্—গরব দেখে কি হয়!'

জয়ার আরক্ত গালের উপর সজোরে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিয়া বড়-বৌ ঘাট হইতে উঠিল।

'নে তাড়াতাড়ি বাসন মেজে ওঠ্ বলছি, ঘরে এখনও বাসি-পাট পড়ে আছে যে কত, তার ঠিক নেই!—ওকি! ও আবার কি করছিস্ লা?'

জয়া তাহার শাড়ীর আঁচলটা ঘাটের জলে বেশ ভাল করিয়া ধুইতেছিল। বলিল, 'গুলের দাগ···'

'গুলের দাগ কি লা সব্বনাশী?'

'তোমার কুল্‌কুচু!' বলিয়া জয়া ভিজা কাপড়টা গুটাইয়া লইয়া আবার আর-একটা থালা মাজিতে বসিল।

'কুল্‌কুচু কি তোর গায়ে করলাম নাকি ? দেখ দেখ—বদনাম দেওয়া দেখ ছুঁড়ির !'

জয়া তেম্‌নি হেঁটমুখেই জবাব দিল, 'না, এম্‌নি পেয়ে গেল দিদি—তুমি যাও।'

কামিনীও উঠিয়াছিল, বলিল, 'তা অমন পায় লো পায়—।'

বড়-বৌ কামিনীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, 'জানো না মা তুমি ! হারামজাদী এখুনি কেমন পুট্‌পুট্‌ করে' লাগাবে গিয়ে সতীর বাবাকে। সেদিন অমনি দিলে আমার শাড়ীটাকে দু'হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে। আমি আর কিছু বললাম না। বলি, কাজ নেই। দেবে এখুনি শুন্‌লে হয়ত ধুম্‌সো-পেটা করে'। আজ আবার দেখ—শুধু শুধু লাগানি কেমন শোনো—কুল্‌কুচু করে' দিলাম গায়ে ! আ মর্‌ ! তোর মত কচি খুঁকি ত আর নই,—সাত সাতটা ছেলের মা। গেয়ান্‌-গম্মি আছে আমার লো—গেয়ান্‌-গম্মি আছে !... বকে' বকে' মুখ ভোঁতা হয়ে গেল—নচ্ছার

হারামজাদীকে বকে' আর কি করব মা—চল !'

মুচিপাড়ার পাশেই তেঁতুল-পুকুরের পাড়ে মাংস-সমেত লাল টক্‌টকে আস্ত একটা গরুর হাড় মুখে লইয়া দুইটা কুকুর খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করিতেছিল।

কামিনী একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'অম্‌নি গোটা গোটাই রাঁধে নাকি ? কে জানে মা !—এ্যাক্‌ থু !'

ঘৃণায় খানিক্‌টা থুতু ফেলিল ; তাহার পর হাতে একটা ঢিল লইয়া তাহাদের তাড়াইতে তাড়াইতে কামিনী আগে আগে চলিল। বড়-বৌ পশ্চাতে।

ঘাট হইতে সবাই তখন চলিয়া গেছে। কিন্তু—

জয়ার বাসন মাজা তখনও শেষ হয় নাই। ...শাড়ীখানি নতুন। গুলের দাগটা হয়ত আর

উঠিবে না!—বাসন মাজিতে মাজিতে ঘন-ঘন সে তার শাড়ীখানির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছিল ।

হঠাৎ তাহার পিঠের উপর ছোট্ট একটা ঢিল আসিয়া পড়িতেই জয়া পিছন্ ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল, নিতান্ত অন্যমনস্কের মত ভজহরি পুকুরের পাড় ধরিয়া ক্রমাগত ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে চলিয়াছে।

জয়া তাহার মাথা ও গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া অত্যন্ত জড়সড় হইয়া কাজ করিতে লাগিল।

আবার আর একটা ঢিল—

এবার ঠিক তাহার মাথায়!

জয়া আবার মুখ ফিরাইল।

ভজহরি আড়-চোখে তাকাইয়া হাসিতেছে…

জয়াও হাসে। হাসিয়া মুখ নামায়।

কিন্তু তাহার এ-হাসি যেন কেমন-কেমন…

দাঁত মাজিবার জন্য রায়দের জামাই ওপারে

'ঝোপের আড়ালে আতা-গাছের একটা ডাল ভাঙিতেছিল। ভজহরি এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। দেখিবামাত্র পুকুরের জলে আরও গোটাকতক্ ঢিল ছুঁড়িয়া হাঁসগুলাকে পাড়ে উঠাইয়া দিয়া বলিল, 'যে পুকুরে হাঁস চরবে—বাস্! সে পুকুরের দফাটি নিশ্চিন্তি! বুঝলে জামাই?'

জামাই আচম্‌কা পিছন ফিরিয়া বলিল, 'তা বটে—'

'কিন্তু আতার ডালে দাঁতন ত ভাল হয় না। নিমের ডাল ভাঙলেই ত' পার।'

'তার চেয়ে কুইনিন্ দিয়ে মাজলেই ত হয়!' বলিয়া রসিকতা করিয়া জামাই একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু ভজহরি তখন অনেক দূরে।

আগে নাকি কল্‌মি-শাকের জঙ্গল ছিল,

এখন আর হয় না। তবু সে পুকুরের নাম কল্‌মি-আড়া।

সেইখানেই মাছ ধরানো হইতেছে। পাঁচজন অংশীদার উপস্থিত। ছেলেয়-বুড়োয় আরও প্রায় জন-দশেক লোক।

মেলা মাছ। ছোট ছোট রুই-কাৎলার পোনা। এক-একবার ঝাঁকে ঝাঁকে উঠিয়া আসে। রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝকে ছোট ছোট মাছগুলি জালে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে। জেলে-মিন্‌ষে ধরে আর ছাড়িয়া দেয়! বলে, 'ছুটু ছুটু মাছ আজ্ঞে —বড় হোক্‌।'

অংশীদারেরা সকলেই তখন ওৎ পাতিয়া গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া আছে। বড়ই বা আর কতক্ষণে হইবে! বেলা ছু'পহর গড়াইয়া গেছে।

শম্ভু বলিল, 'যা হয় তাই কর বাবা! খাব যে কখন্‌ তার ঠিক নেই।'

পাশেই অনন্ত লায়েকের ঘর। পুকুরে জাল

ফেলিবার শব্দ পাইয়া, টপ্ করিয়া সে তাহার ভাঙা প্রাচীরের উপর ডিঙাইয়া উঠিয়া ঝুপ্ করিয়া এপারে আসিয়া নামিল। সাদা ধপ্‌ধপে পরিষ্কার গায়ের রং—হাঁপানীর রুগী। বাঁশের লাঠিটি হাত হইতে নামাইয়া সে বসিয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। বুকের পাঁজরাগুলা দপ্ দপ্ করিয়া উঠা-নামা করিতেছিল; দেখিলে মনে হয়—এখনই বা যায়! কিন্তু যায় নাই। ঠিক্ এম্‌নি করিয়াই সে আজ আটটি বৎসর বাঁচিয়া আছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সে ফু ফু করিয়া নাকে-মুখে নিশ্বাস ফেলিয়া একটুখানি স্থির হইল। তাহার পর ডাগর ডাগর চোখ দুইটি তাহার তুলিয়া বলিল, 'আগোল্‌দার আমিই। কল্‌মি-আড়া থেকে একটি চুনো-পুঁটি কই যাক্ দেখি চুরি! সব-বেটা জানে যে, এই অনন্ত শর্ম্মা বসে বসে ধুঁকছে হয়ত সারারাত। যাব আর অম্‌নি তেরে রে রে! তার চেয়ে কাজ নেই বাবা!—ঘুম কোথা

পাবে? ঘুম নেই ····· সেই কুঁক্ড়ো-ডাকা রাত পর্য্যন্ত······ফু—!'

আবার তাহার দম উঠিতে লাগিল।

'বাস্! পাঁচ ভাগীতে পাঁচটি! তাহ'লেই আমার হাতা-চড়্চড়ি খুব! অন্ন আমার পিস্তুত। —নাঃ! রোদে বসি, যাই! বাতাসের চোটে একেবারে হাওয়া গাড়ী ছুটিয়ে দিলে।'

লাঠিটি হাতে লইয়া গাছের তলা হইতে অনন্ত একটুখানি সরিয়া বসিল।

নিশু ভট্চাজ্ বলিল, 'ময়নাবুনির ওষুধ খেলে না, কেন অনন্ত, ধম্মরাজের ওষুধ?'

ঔষধের নাম শুনিয়া রাগে যেন অনন্ত হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

'ধেৎ তেরি ওষুধ কাঁহাকা! ওষুধের নাম করিস্ না আমার কাছে—ওষুধ!'

তাহার পর ডান হাত দিয়া ঠ্যাঙাটাকে মাটিতে ঠুকিয়া বলিল, 'ঠাকুর-দ্যাব্তার ইয়ে করি আমি,—জানিস্? সব বেটা-বেটিকে চেনা

আছে আমার! পঁচিশ গণ্ডা মাদুলী নিয়েছিলাম, আর না হবে ত' হাজারো রকমের ওষুধ। কিন্তু ব্যারামের কই এতটুকু টল্-বেটল্ হলো?—সেই যে-কে সেই! শেষকালে রেগে-মেগে দিলাম ছিঁড়ে একদিন মাদুলিগুলো সব। পটাপট্ ছিড়েছি আর ফেলেছি এই কল্‌মি-আড়ার জলে। বলি,—বাস্! এইবার ধীরে ধীরে একদিন ফুঁকে দিলেই খালাস! শিঙের শব্দ শুনে আসিস যেন তোরা সব—বুঝলি নিশু? ফু—।'

বলিয়া অনন্ত আবার দম টানিতে লাগিল।

পাশ দিয়া একটা কালো রঙের কুকুর পার হইয়া যাইতেছিল, অনন্ত তাহার হাতের ঠ্যাঙাটি দিয়া তাহার পিঠের উপর এক ঘা বসাইয়া দিতেই কুকুরটা কোমর বাঁকাইয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া পলাইল।

অনন্ত বলিল, 'আর একটু হলেই বাছাধন—চণ্ডীচরণ! সে-বছর সেই বড় লাঠিটা থাক্‌তো তখন হাতে। কার একটা ছেলেকে ঠ্যাঙাতে

গিয়ে এমন এক বাড়ি মেরে ফেললাম ওদের ওই ল-বৌএর হাতে, যে একেবারে চেড়েক্-ডেড়েং! আঙুলের গিঁট্গুলো সব দড়ির মত ফুলে উঠলো। বাস্! সেই থেকে এই ছোট লাঠি। ফু—।'

অনন্ত তাহার হাতের লাঠিটি তুলিয়া একবার দেখাইল।

কিন্তু তাহার নজর ছিল জেলের দিকে। জালটা তখন সে পাড়ে তুলিয়া ঝাড়িতে সুরু করিয়াছে।

অনন্ত উঠিল। কোমরে-কাঁকালে হাত দিয়া, দু'বার বসিয়া, দু'বার উঠিয়া, অতি কষ্টে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া বিড়ালের মত ছোঁ মারিয়া দাঁড়াইল।

'ফেলিস্নে, ফেলিস্নে ওটা তোর পোনা নয় বাবা, ওটা কাল্-বাউস্।'

টপ্ করিয়া অনন্ত তাহার জাল হইতে মাছটিকে এক রকম জোর করিয়াই টানিয়া ছাড়াইয়া লইল।

জেলে ত' রাগিয়া আগুন!

'জিউ দিতে পারি ঠাউর, মাছ দিতে পারি না।'

মাছটা সে কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত!

কোঁচড়ের তলায় মাছটি তাড়াতাড়ি গুঁজিয়া লইয়া অনন্ত তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিল।—'বেশ বাপু বেশ, দিস্‌নে তুই। ভারি ত' একটা আঙুলের মতন মাছ…'

অনন্ত ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু অংশীদার-দের মধ্যে শ্যামাশরণ বলিয়া উঠিল, 'দিলি না কেন অম্‌নি জাল দিয়ে এক সাপ্‌টি মেরে ওকে। জীবনে আর কেয়টের পাশ ঘেঁস্‌তো না কোনো দিন।'

কথাটা অনন্তর কানে গিয়াছিল।

বাজিল নিশ্চয়ই!—মরণাপন্ন রুগীর বড় বাজে! কোঁচড় হইতে ছোট মাছটি সে ধীরে ধীরে বাহির করিয়া শ্যামাশরণের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'নে তোর মাছ!'

বলিয়াই সে হাঁপানীর টানে বসিয়া পড়িল।

শিবু চাটুজ্যে পাশেই বসিয়াছিল।

ব্যাপারটা ভাল হয় নাই দেখিয়া সে যেন নিজেই একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল। মাটি হইতে আধ-মরা পোনার বাচ্চাটি তুলিয়া লইয়া অনন্তর হাতের মুঠায় গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—'না রে না—রাগ করে না, ছিঃ! তোকে বলেনি। তোকে বলেনি।'

অনন্তও এতক্ষণে সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। মাছটা সে আবার তাহার আঁচলে গুঁজিয়া বলিল, 'না—। ফু! দুটো বিয়ে করে না-হয় আট শ' টাকাই পেয়েচিস, আমার না হয় আটটা পয়সা নাই—আমি না হয় গরীব! তাই বলে' জেলের মার খাব? আর তুই কিনা বসে' বসে' হুকুম দিবি! এ্যাঁ—!'

খুব জোরে জোরে কথা-কয়টা বলিয়া অনন্তর বুকের পাঁজরাগুলা একেবারে শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া যাইতে লাগিল। চোখ দুইটাও অসম্ভব রকম বড় হইয়া পড়িয়াছিল,—এবং রাগে ও অভিমানে তাহার সেই দুইটা বিস্তৃত

চোখের কানায় কানায় তখন জল দেখা দিয়াছে।

অনন্ত একবার উঠিল, আবার বসিল। কোমরে হাত দিয়া আবার একবার দাঁড়াইয়া আবার বসিল। মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝা গেল—দম লইতে তাহার অত্যন্ত যাতনা হইতেছে। হঠাৎ এতখানি রাগিয়া উঠা হয়ত ভাল হয় নাই।

তবু সে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। শ্যামাশরণের মুখের পানে একবার তাকাইয়া বলিল, 'জয়ীকে বিয়ে যে তুই করলি সাতটা ছেলের বাপ হয়ে—তার গোঁড়ায় কে, তাই শুনি? ভেতরের রহস্যি ত কেউ···'

আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু শ্যামাশরণ তাহাকে কতক্-বা চোখ টিপিয়া, কতক্ বা—ধমক্ দিয়া চুপ করাইয়া দিল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব হয়েছে! খুব বাহাদুর! চুপ কর্ হতভাগা চুপ কর্,—নইলে মরে' যাবি—এক্ষুণি মরে' যাবি।'

অনন্ত পুকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। বলিল, 'হুঃ! মরে যাবি! মরছি যে আজ আট বছর, তাই মরে যাবি!'

... ...

জেলে আসিয়া মাছ ভাগ করিল।

'এই ডগা-পোনা গুলি অন্য বছর আরও বড় হয়। কল্‌মি-আড়ার মাছের মিষ্টি কত ঠাউর—!'

হাত তুইটা মাটিতে পাতিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া বসিয়া বসিয়া অনন্ত মাছের ভাগ দেখিতেছিল। বলিল, 'হরিপদর ভাগটা কম হলো। দে আর একটা ছোট মাছ দিয়ে দে! দিলেই ছুটি।'

কিন্তু জেলে সে কথায় কান দিল না, বলিল, 'লেন সব, আপন-আপন ভাগ তুলে নিয়ে চলে যান ঝট্‌পট্‌।'

কিন্তু যাইবার সময় প্রত্যেকেই একটি করিয়া ছোট মাছ অনন্তকে দিয়া গেল।

শ্যামাশরণ মাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া আবার সে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; আর একটা মাছ সে অনন্তর কোলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'মাছ মাছ করছিস, নে—মাছই খেগে যা !'

... ...

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—শ্যামাশরণের উপর রাগ তাহার একটুখানি লাগিয়াই রহিল। জয়ীকে বিবাহ করিবার ভিতরের 'রহস্যিটুকু' প্রকাশ করিবার লোভ সে কোন প্রকারেই সাম্‌লাইতে পারিল না। মরণের পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার মত গুপ্ত সঞ্চিত ধনের মধ্যে বুঝি-বা তাহার এইটুকুই ছিল।

প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু বিশেষ কাহারও কাছে নয়—

খাওয়া-দাওয়ার পর শিবু চাটুজ্যে রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা কাটা শালগাছের গুঁড়ির

উপর বসিয়া আরাম করিতেছিল। অনন্ত বলিল, 'এই যে!'

বলিয়া তাহার কাছে গিয়া বসিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া আসল কথাটি সে বলিতে সুরু করিল—

'কিন্তু কারও কাছে বলো না তুমি ভাই, কাজ কি এসব জানাজানিতে...

'বসে' বসে' ধুঁক্‌ছিই ত সারারাত। তারপর বলি, শব্দটা কিসের শোনাই যাক্। মেয়ে-লোকের কান্না হে!—পষ্ট শুনলাম, হুঁক্‌রে হুঁক্‌রে কাঁদছে—সদানন্দদের খামারে—পাকা ধানের বড় বড় ছুটো পালুইএর ঠিক মাঝখানে।

'অন্ধকারটা কেটে তখন ঠিক চাঁদ উঠ্‌ছে। রাত বেশি না,—হদ্দ পহর-দেড়েক।

'লাঠি নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে গেলাম...

'ভাঙা পাঁচিরের ওপারে সবই ত' দেখা যায়। দিব্যি সাদা ফট্‌ফটে কাপড় পরে'—আব্‌ছা অন্ধকার হলেও চিনতে পারা গেল ঠিক্—জয়ী

কাঁদছে। আর-একজনকে চিনতে একটু দেরি হলো। পিছন ফিরে বসেছিল,—চিনলাম গলার আওয়াজে। বলে, 'করেছিস্ কি সর্ব্বনাশ! ওষুধ এনেছিলাম, ধাঁ করে নষ্ট হয়ে যেতো।'

'অবাক্! ভাই অবাক্! গালে হাত দিয়ে দাঁড়ালাম। বলিহারি যাই শ্যামা! তোর পেটে এত বিদ্যে!

'জয়ী তবু কাঁদতে থাকে।—ধীরে ধীরে চাঁদ উঠলো। হুঁস্ নাই! ধব্‌ধবে চাঁদের আলো খড়ের গাদা ডিঙিয়ে ওদের গায়ে গিয়ে পড়লো— তবু হুঁস্ নাই! হাত বাড়িয়ে জয়ীকে ধরতে গেল—

'হয়েছে কি তার? এত কান্না কিসের? আমার নাম করিসনি ত?'

'জয়ীর কী রাগ! কাঁদতে কাঁদতে শ্যামার হাতটাকে সে ঝট্‌কে ফেলে দিলে,—'যাও!'

'শ্যামা আবার বলে, 'আমার নাম করিসনি ত?'

'জয়ী ফুলে' ফুলে' শুধু কাঁদে,—জবাব দেয় না।'

'শ্যামা আবার তাকে ধরতে যায়—জয়ী আবার সরিয়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে শেষে বললে, 'জোর করে তুমি এইটি···বাবারে! আমি কি করি এবার? বিষ এনে দাও, খাব আমি।'

'শ্যামা কিন্তু শয়তান ছোকরা! বলে কি না 'জোর করে বললে লোকে শুন্‌বে কেন? খবরদার আমার নাম করিস না কারও কাছে!'

'জয়ী আবার রেগে উঠলো, 'না—! সর্ব্বনাশ করেছ আমার···' বলেই সে আবার হুঁ ক্‌রে হুঁ ক্‌রে কাঁদতে লাগল।

'শীতে আমার তখন কাঁপুনি ধরেছে। বুঝলে শিবু? হাঁপানীর রুগী, আর কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকি বল? ভাবলাম, সাড়াশব্দ করে' একবার বাছাধনকে টের পাইয়ে দিই! ওদের ওই পাশের পুকুরটায় সদানন্দর রাজহাঁসগুলো থাকতো তখন। হঠাৎ সেগুলো সব একসঙ্গে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে'

উঠলো।—যেই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করে' ওঠা—বাস! সড়াচ্ ক'রে কে কোন্ দিকে উধাউ! আমি ত' না চাইলাম বাট্—বুঝলে ভাই শিবু, আন্দাজি হাঁকলাম, 'বলি, কি হে! শ্যামাশরণ নাকি?'

'আর যায় কোথা! শ্যামাশরণ কাছেই কোথা লুকিয়েছিল, ভাঙা পাঁচিরটা টপ্‌কে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে চুপি চুপি বল্‌লে, 'অনন্ত! অনন্ত! আয় ভাই —আয়, আয়, আয়··· !'

'ব্যস্! সে-দিনের মত ওইখানেই ত হয়ে গেল চুপ্। কিন্তু আমি চুপ্ করলে কি হবে? ধর্ম্মের ঢাক—গুড়্ গুড়্ করে' আপনিই বাজে। ওদিকে জয়ীর মা-মাগী আবার আর-এক শয়তান! কেউ এতটুকু নামগন্ধ টের পেলে না—শ্যামাশরণকে কি করে যে রাজি করলে ভাই কে জানে!

'পট্ করে কোন্ ফাঁকে যে বিয়েটা সেরে দিলে—বাস্!

'দেখ্‌লে না, বিয়ের পরেই সেই ছেলেটা হলো? হয়ে মরে গেল। যাক্—। একথা

কাউকে বলতাম না আমি, তবে দেখলে না সেদিন, ওর টেংরি দেখলে না? জেলেকে বলে কিনা—মার্ এক-সিপ্‌টি তুই...'

অনন্ত প্রাণ ভরিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

শিবু চাটুজ্যে বলিল, 'থাক্, আর এ-কথা জানাস্ না কাউকে!'

'জানাতাম না ত',—তোমাকেই কি বলতাম নাকি? জানে? কই এতদিনের ভেতর পাখ-পক্ষী কেউ জানে? তবে ওই সেদিনের সেই...'

হুঁকা টানিতে টানিতে হরিপদ সেই দিকেই আসিতেছিল,—কথাটা মাঝ পথেই বন্ধ হইয়া গেল।

হরিপদ একটা সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, বলিল, 'এমাসে একটা পাকা ভোজ আছে হে! জীবানন্দর ছেলের অন্ন-প্রাশন আছে পনরই।'

অনন্ত সোৎসাহে লাফাইয়া উঠিল, 'তাই নাকি?...আচ্ছা এ-মাসটা ত' গেল,—ও-মাসে?'

তাহার পর সম্বৎসরের মধ্যে কোথায় কাহার

বাড়ীতে কি-সব কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা আছে তাহারই হিসাব চলিতে লাগিল।

সেদিন এক গাদা বাসন কাঁধে লইয়া পুকুরের ঘাটে জয়া মাজিতে যাইতেছিল,—রোজ যেমন যায়।

মুচিপাড়ার মাথার উপর সূর্য্য তখন সবে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

আমগাছের তলায় অতুল দাঁড়াইয়া ছিল। কাছে যাইতেই চুপি চুপি বলিল, 'এই নে জয়া তোর মা দিয়েছে এই টাকা দুটি —।'

টাকা দুইটি সে তাহার হাতে দিতে যাইতে-ছিল।

পথে দাঁড়াইয়া জয়া বলিল, 'না আমি নেব না টাকা,—ফিরে দিও তুমি।—একজোড়া রুলী দিতে বললাম, তা হ'লো না দুটো টাকা! টাকা নিয়ে কি করব আমি?'

'কি আবার করবি ? নিয়ে যা !' বলিয়া অতুল টাকা দুইটি আবার তাহাকে দিতে গেল।

টাকা সে কিছুতেই লইবে না। জয়া ঘাটের দিকে আগাইয়া চলিল।

কদমতলার কাছে গিয়া আবার কি ভাবিয়া জয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দিয়ে যাও অতুল দাদা !'

হাসিতে হাসিতে অতুল ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'নে…।'

জয়া বলিল, 'দুটো হাতেই এঁটো আমার,… ওইখানে ফেলে দাও।…না, না, চাবির এই রিংএর সঙ্গে বেঁধে দাও পিঠের আঁচলে।'

জয়া পিছন্ ফিরিয়া দাঁড়াইল। আঁচলের খুঁটে টাকা দুইটি বাঁধিতে গিয়া অতুলের হাত দুইটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। চারিদিকে কোথাও একটি জন-প্রাণী নাই…

খুঁটের গিঁটটি বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া

অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে জয়ার পিঠের উপর হঠাৎ একটা চিম্‌টি কাটিয়া ফেলিল।

জয়া কিছুই বলিল না, ঘাড় ফিরাইয়া একটু-খানি মুচ্‌কি হাসিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অতুল কিন্তু না পারিল কিছু বলিতে, না পারিল চলিয়া যাইতে, হতভম্বের মত সেই-খানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অতগুলা বাসন মাজিতে একটুখানি সময় লাগে।

জয়া কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া দেখে, হুলুস্থুল কাণ্ড!

শ্যামাশরণ রকের উপর বসিয়া তামাক টানিতেছিল। একদিকে বড়-বৌ, একদিকে কামিনীপিসি,—এদিকে ওদিকে পাড়ার আরও দু'চারটা মেয়ে আসিয়া জড় হইয়াছে।

বড়-বৌ বলিল, 'দেখ দেখ সৰ্ব্বনাশীর খুঁটের পানে তাকিয়ে দেখ,—কানা ত' হওনি এখনও !'

শ্যামাশরণ দেখিল—

বাসনগুলা জয়া রান্নাঘরে রাখিতে যাইতেছিল, চাবির রিংএর সঙ্গে টাকার মত কি যেন বাঁধা রহিয়াছে স্পষ্টই দেখা গেল।

শ্যামাশরণের হুঁকা টানা তখন বন্ধ হইয়াছে। এদিক-ওদিক বারকতক চাহিয়া হুঁকাটা সে দরজার পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল. 'বটে—। দেখেছ ত' ঠিক ?'

বড়-বৌ, বলিল, 'জানি না। ঠিক বেঠিক তোমার ওই পিসিমাকে জিজ্ঞাসা কর। সতীনের বাটিতে কে নাকি কোথা গু গুলে খেয়েছিল—সতীনের কথা বিশ্বেস হবে কেন ?'

পিসিমা বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, দেখলাম যে ভাঁয়া চোখের ছাম্‌নে ! তা নইলে একথা কি সাধ করে' কেউ······ছি, ছি, সকল-খাকী ! কর্‌লি কি তুই !'

আরও দু'একটা মেয়ের ছি ছি শব্দ কপাটের আড়াল হইতে শোনা গেল।

শ্যামাশরণ তাহার পায়ের চটি জুতা একটা হাতে লইয়া উঠিল।

সুমুখে উঠানেই দু'জনের মুখোমুখি।

পট্ করিয়া জয়ার পিঠের উপর এক চটি বসাইয়া দিয়া শ্যামাশরণ বলিল, 'টাকা কোথায় পেলি তাই বল্—!'

জয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সকলের মুখের পানেই একবার তাকাইল।

জবাব দিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া শ্যামাশরণের রাগ যেন আরও চাপিয়া গেল। এইবার তাহার মাথার উপর আর এক জুতা বসাইয়া দিয়া বলিল, 'হারামজাদী—! মুখ পুড়িয়ে দিলে আমার। বল্—এখনও বল্‌ছি—বল্!'

জয়ার চোখে জল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখখানা তখন হিঙুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, 'যেখানেই পাই। তোমার কি?'

এবার আর শ্যামাশরণের অবিশ্বাসের কিছুই রহিল না, জুতা দিয়া মারিতে মারিতে ঘাড়ে ধরিয়া জয়াকে সে একেবারে বাঁধানো রকের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেল—

'বেরো হারামজাদী, এক্ষুণি বেরো আমার বাড়ী থেকে··· দূর্ হ' !'

মুখ দিয়া রাগে আর তাহার বেশি কিছু বাহির হইতেছিল না। মনে হইতেছিল কথাগুলা তাহার পেট হইতে মুখে আসিয়া কোথায় যেন আট্‌কাইয়া যাইতেছে।

বড়-বৌএর ছেলে-মেয়েগুলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছিল। কোলের মেয়েটা মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কামিনী-পিসি বলিল, 'মারিসনে বাবা মারিসনে ! বেশি কেলেঙ্কারী বাড়াস্ নেকো আর ! দূর করে' তাড়িয়ে দে ঘর থেকে। আ-মর্ সব্বনাশী ! সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোলো তোকে !'

কিন্তু এত মার খাইয়াও জয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিল না, মুখ দিয়া একটি কথাও তাহার বাহির হইল না। চোখ দিয়া অশ্রুর ধারা দর্ দর্ করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল মাত্র।

ধীরে ধীরে সদর দরজা দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গত রাত্রি হইতে একটা হাঁস তাহার ঘরে ঢুকে নাই,—ঝুঁঝ্কি রাত থাকিতে কামিনী-পিসি আজ তাহারই খবরদারীতে বাহির হয়। তাহা না হইলে এসব কাণ্ড স্বচক্ষে সে আজ দেখিল কেমন করিয়া!

এঁটো বাসনের গাদা দরজায় নামাইয়া অতুলের সঙ্গে জয়ী পোড়ারমুখী কখন্ যে ঠিক তাহার খামারের ভিতর গিয়া ঢোকে—পিসি তাহা দেখে নাই। দেখিল যখন—লজ্জার কথা··· সে সব বলিতে নাই। তাহার পর হাসিতে হাসিতে গলা ধরাধরি করিয়া কেমন করিয়া যে

দুজনে তাহারা বাহির হইয়া আসে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কতক্ষণ ধরিয়া তাহাদের কথা হয় এবং কেমন করিয়া টাকাকয়টি অতুল তাহার খুঁটে বাঁধিয়া দেয়—এই সব কথাই আবার আর-একবার ভাল করিয়া হইতেছিল।

জয়া যে সকলের পশ্চাতে কখন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ টেরও পায় নাই।

ডাকিল, 'দিদি!'

বড়-বৌ পিছন্ ফিরিয়া দেখে, জয়া।

'ভাঁড়ারের চাবিটা ছিল…' বলিয়া ঝন্ করিয়া চাবিটা তাহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া জয়া ছুটিয়া পলাইল।

ছোট গ্রাম। কথাটা কিন্তু বড়। কাজেই এই বড় কথা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইতে বড় বেশি দেরি হইল না।

শুনিয়া অবধি অতুলের কাঁপুনি বাড়িল। ঠিক যেন জ্বর আসিয়াছে!

জয়াকে জিজ্ঞাসা করিলে কোনও জবাব পাওয়া যায় না। বলে, 'যা তোরা সব যা···। বেরো আমার সুমুখ থেকে।'

অপরাহ্ণ বেলায় অতুলকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছিল।

প্রথমে সে লজ্জায় আসিতে চায় নাই। তাহার পর আসিল। পাংলা সিপ্‌সিপে ফর্সা-পানা বছর-পঁচিশের এক ছোকরা।

রাস্তার ধারে শালগাছের সেই গুঁড়িটার উপর জন-চারেক্ লোক বসিয়া। শ্যামাশরণ উপস্থিত। তাহারই পাশে মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া অনন্ত লায়েক হাঁপাইতেছিল।

সারদা বলিল, 'নে রে অতুল, মা-কালীর ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে বল্—যা ঘটেছিল ঠিক্ সত্যি সত্যি বলে' ফেল্। ভয় নেই···কেউ কিচ্ছু বলবে না তোকে।'

সুমুখেই কালী-মন্দির।

কাঁপিতে কাঁপিতে অতুল গিয়া কালীর বেদী হইতে ফুল ও বেলপাতা হাতে লইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সারদা বলিল, 'বল্ এই ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে। মিছে কথা বলিস্ ত' কুষ্ঠব্যাধি হবে, তা মনে রাখিস্ কিন্তু। টাকা দিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ দিয়েছিলাম—ছটি টাকা।'

'কেন?'

'আমাদের বৌ ওর কাছে ধার নিয়েছিল।'

'আর—?'

'আর কিচ্ছু না। আমার কোনও দোষ নেই। আমি নিদ্দুষী।'

কথা-কয়টা বলিয়াই অতুল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনন্ত আর থাকিতে পারিল না। ঘাড় উঁচু করিয়া শ্যামাশরণের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'তুইও ঠিক এই কথাই বল্তিস্। সেই সেদিন কেউ যদি শুধোতো তোকে?'

শ্যামাশরণ হেঁট্‌মুখে হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

হাসিতে হাসিতে অনন্ত তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে দম টানিতেছে—।

সমাপ্ত



এই লেখকের লেখা

ঝড়ো-হাওয়া	...	...	২৲
বাংলার মেয়ে	...	...	২৲
ষোল-আনা	...	...	১৸০
মাটির ঘর	...	...	২৲
জোয়ার-ভাটা	...	...	২॥০
মহাযুদ্ধের ইতিহাস	...	...	২॥০
বাণ্‌-ভাসি	...	...	১।০
অতসী	...	...	১৸০
বহুবচন	...	...	১।০
নীহারিকা ওয়াচ্‌ কোম্পানী		...	১।০
মাটির রাজা			
কয়লা-কুঠি			

[illegible]





